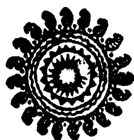
দুর্গ-তারণ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়



সাহিত্য জগৎ • কলিকাতা

২০৩।৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট



প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৪

প্রকাশক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

শ্যামল সেন

প্রচ্ছদপট ব্লক—

ব্লকম্যান (প্রসেস)

মুদ্রাকর—অরবিন্দ সরদার

শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৮।৩, চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা—৯

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

উৎসর্গ

লেডি সুচন্দ্রা মিত্র

পূজনীয়াসু

মায়ের স্নেহে

যিনি আমার সব ত্রুটি

ঢেকে দেন

রচনাকাল

১১ই এপ্রিল, ১৯৫৭ (বৃহস্পতিবার সকাল)

থেকে

৭ই অগস্ট, ১৯৫৭ (বুধবার সন্ধ্যা)

কলিকাতা

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর

এই মর্তভূমি

দূরের মিছিল

মনে মনে

মুখর লণ্ডন

ছায়া মারীচ

ইভনিং ইন প্যারিস

নতুন বাসর

জনসম্রাট

ব্যালেরিনা

আজও বোধ হয় সুনন্দা বাড়ি থাকবে না।

আজও যদি সে অন্যান্য দিনের মতো বেরিয়ে যায়, তাহলে আর ও বাড়িতে যাবে না দেবদত্ত। অত সময় নেই তার।

অকারণেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠল দেবদত্তর।

শীতকাল। মাঘের প্রায় মাঝামাঝি। একেবারেই শীত পড়েনি কলকাতায়। আজ প্রথম একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। রাস্তায় দোকানের সামনে কারা তোলা উনুন ধরিয়েছে, তারই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে।

সাদা পাতলা পাঞ্জাবি পরেই দেবদত্ত বেরিয়ে পড়েছে। গরম কিছু গায়ে দেবার দরকার মনে করেনি। শীত বেশি লাগে না তার। কিন্তু শীত না লাগলেও রাস্তায় পরিচিত কারুর সংগে দেখা হলে প্রশ্নের জবাবদিহি করতে প্রাণান্ত হয় দেবদত্তর।

অর্থাৎ ঠাণ্ডা লেগে একটা বড় অসুখ তার যেন হবেই আর দায়টা যেন চেনা লোকের।

আজও সেই পুরানো চাকর দরজা খুলে দিল।

দেবদত্ত আর একদিন এ বাড়িতে গান গেয়ে গেছে। সেদিন তার গলা শুনে বোধ হয় দিশা হারিয়ে গোটা দুই কাপ ভেঙে সুনন্দার মা'র কাছে তাড়া খেয়েছিল এই চাকরটাই।

সে হেসে নমস্কার করল দেবদত্তকে। আলো জ্বেলে খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, বসেন বাবু!

দেবদত্ত বসল না। পাঞ্জাবির পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করল, দিদিমনি আছেন?

তিনি বেরিয়ে গেছেন। দিল্লী থেকে হীরু দাদাবাবু আসছেন কি-না, যেন গভীর রহস্যের সন্ধান পেয়েছে এমন মুখের ভাব করে চাকর বলল, এই তেনার সংগে হেথায় হোথায় বেড়াতে বের হয়েছেন।

তার সব কথা মন দিয়ে শোনবার ধৈর্য ছিল না দেবদত্তর। তার কানে শুধু ঢুকল, সুনন্দা নেই, সে বেড়াতে বেরিয়েছে।

যাক না হাওয়া খেতে যেখানে খুশি। কিন্তু আগ্রহের ভান করে দেবদত্তকে এখানে টেনে আনার মানে কি! অপমানে শরীর জ্বলে উঠল তার!

বেশ জোর গলায় সে চাকরটাকে বলল, তোমার দিদিমনিকে বলে দিও আমি এসেছিলাম—

বিনীত ভাবে চাকর বলল, বলব বৈকি, আজ্ঞে নিশ্চয় বলব!

একটু ইতস্তত করে কি ভেবে দেবদত্ত বলল, বলে দিও আমি আর আসতে পারব না।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাকরটা তাকিয়ে রইল। দেবদত্ত হঠাৎ কেন রেগে উঠল সে কথা বোঝবার সাধ্য নেই তার।

কিন্তু আর কিছু বলবার অবসর পেল না সে।

দেবদত্ত ততক্ষণে রাস্তায় নেমেছে।

এখুনি বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মেজাজ বিগড়ে গেছে হঠাৎ।

এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতেও মন চাইছে না। কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে দেবদত্ত বড় রাস্তা ধরে সোজা হাঁটতে লাগল।

এই শেষ।

এমন করে যাকে তাকে গান শেখাতে গিয়ে সে আর কখনও কাউকে অপমান করবার অবকাশ দেবে না। ঢের হয়েছে।

ছুটতে ছুটতে সুনন্দার বাড়ির সেই চাকর দেবদত্তর পাশে এসে দাঁড়াল। একটা পুরানো মানুষকে খুঁজে বের করবাব উল্লাস ফুটে উঠল তার মুখে।

বাবু, মা আপনাকে ডাকছেন।

আমাকে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বললেন খুব জরুরি দরকার আছে!

দেবদত্তর সংগে সুনন্দার মার কি জরুরি দরকার থাকতে পারে? কখনও তার সামনে বার হননি তিনি। সে তাঁকে দেখেনি আজও।

হয় তো মেয়ের হয়ে দু কথা বলবেন। দেবদত্ত বার বার এতটা পথ এসে ফিরে যায় বলে দুঃখ প্রকাশ করবেন। এ ছাড়া আর কোন দরকারের কথা তার মাথায় এল না।

দেবদত্ত আবার ফিরে চলল চাকরের সংগে।

দরকার জরুরি বটে!

না হলে মান থাকে না।

দেবদত্ত কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল।

সুনন্দার মা বললেন, আমি জানতাম না আপনি এসেছিলেন। আপনি চলে যাবার পর কমলাকান্ত আমাকে খবর দিল—

দেবদত্ত বলল, আমাকে বলল বিশেষ দরকারের জন্যে আপনি নাকি আমায় ডাকছেন?

হ্যাঁ, অবান্তর কথা না বলে সুনন্দার মা সংক্ষেপে কাজের কথা তুললেন, নন্দা আমাকে বারবার বলে গেছে আজ আপনাব মাইনেটা দিয়ে দিতে—

কিসের মাইনে?

তিনটে দশ টাকার নোট দেবদত্তর দিকে বাড়িয়ে দিযে সুনন্দার মা বললেন, আজ এক মাস হল আপনি ওব গানের মাস্টার হয়ে এ বাড়িতে আসছেন। সপ্তাহে দুদিন শেখাবেন—এই হিসেবে আপনার তিরিশ টাকা মাইনে তো ও ঠিক করেছিল?

প্রথমে দেবদত্ত কোন উত্তর দিতে পাবল না। ওর মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেছে।

মেয়ে তাহলে ভোলে নি আজ ওর এ বাড়িতে আসবার দিন। নিজে গান শেখবার সময় করতে পারল না কিন্তু মাকে বলে গেছে পাওনা মিটিয়ে দিতে। যেন টাকা পেয়ে মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে দেবদত্তর। পরিশ্রম না করে পারিশ্রমিক পাচ্ছে বলে সুনন্দার মত উদার মনের ছাত্রী পাবার জন্যে গর্ব বোধ করবে।

দু-এক মিনিট চুপ করে রইল দেবদত্ত।

কমলাকান্ত শুধু এক কাপ চা রেখে গেছে তার পাশের টিপয়ের ওপর। চা জুড়িয়ে গেছে শীতের হাওয়ায়।

এই যে—সুনন্দার মা দেবদত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে টাকাটা নিয়ে নিতে নীরব অনুরোধ জানালেন।

দেবদত্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মাপ করবেন। ও টাকা আমি

নিতে পারব না। আপনার মেয়ের গানের মাস্টার হিসেবে কিছুই আমার পাওনা হয়নি। কারণ একদিনও তাঁকে গান শেখাবার সৌভাগ্য হয় নি আমার।

তবু আপনি নিয়ম করে ঠিক সময়ে গান শেখাতে এসেছিলেন—

সে তো কত জায়গায় বেড়াতেও যাই। মাইনে নেবার প্রশ্নই যেখানে ওঠে না সেখানে কেমন করে টাকা নেব বলুন? আপনার মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী। আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বললেই তিনি বুঝতে পারবেন।

মেয়ের প্রশংসায় খুশি হয়ে সুনন্দার মা বললেন, গানে ওর খুব ঝোঁক। কিন্তু এই একটা মাস একটু ঘুরে টুরে বেড়াতে হচ্ছে বলে সময় করতে পারে নি।

দেবদত্ত হেসে বলল, তবু আমাকে ঠিক দিনে মাইনে দেবার কথা ভোলেন নি বলে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন।

চা-টা খাবেন না?

না। আমি বেশি চা খাই না, দেবদত্ত ঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আরও একটা কথা আপনার মেয়েকে বলে দেবেন আমার পক্ষে আর তাঁকে গান শেখানো সম্ভব হবে না।

কেন? আপনার গান কিন্তু নন্দা খুব ভালবাসে।

সেকথা আর আমি জানি না? দেবদত্ত হেসে বলল, তা না হলে গান না শিখে তিরিশ টাকা মাইনে দেয়? কিন্তু আমি অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আসবার অসুবিধা আছে।

যন্ত্রের মত সুনন্দার মা বললেন, বেশ বলে দেব তাকে।

দেবদত্ত বেরিয়ে গেল।

রূপ হঠাৎ পাল্টে গেল প্রকৃতির। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসটা কনকনে ধারালো হয়ে উঠল।

হয় হোক। তবু শীত লাগবে না দেবদত্তর।

ভেবেছিল দু একজন বন্ধুর সংগে দেখা করবে। নিজে একটা গানের জলসা করতে চায়। বড় রকমের আয়োজন করে নতুন সুরের নতুন গান শোনাবে লোককে।

কিন্তু আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। সোজা বাড়ি ফিরে যাবে দেবদত্ত। শুধু শুধু বৃষ্টিতে ভিজে লাভ নেই। জলে ভিজে কারুর বাড়ি যাওয়া যায় না।

মোট কথা গানের মাস্টাব হয়ে এমন ছাত্রীর বাড়ি আর কখনও সে যাবে না।

কাদা ছিটিয়ে গেল একটা মোটর গাড়ি। মোটর গাড়ি না ছিটোলেও চটির কাদায় ধুতিটা বোধহয় নোংরা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

বিরাট মোটর গাড়িটা পিছিয়ে আসছে। ভেতরের মানুষটি বুঝতে পেরেছে নাকি কাদা লেগেছে দেবদত্তর গায়ে?

কিন্তু এমন তো কখনও হয় না। কাদা ছিটিয়ে মোটর গাড়ির মালিক কাছে এসে ক্ষমা চায় নাকি কোন কালে!

হ্যাঁ চায়। না হলে লোকটা তার দিকে চেয়ে অমন করে হাসবে কেন?

এই দেবু উঠে আয় গাড়িতে। মারা পড়বি যে। গাধার মত এখনকার বৃষ্টিতে ভিজচিস কেন? ট্যাক্সি নিতে পারিস নি একটা?

তুই! কী মোটা হয়েছিস! আমি তো চিনতেই পারি নি।

শরৎ ব্যানার্জি সশব্দে বিরাট মোটরের দরজা বন্ধ করে হেসে বলল, নজর দিস না। তুই কিন্তু বিশ্রীরকম রোগা হয়ে গেছিস।

তাই না কি?

দেবদত্তর কথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভাবে শরৎ বলল, গাড়িটা কেমন দেখছিস?

চমৎকার! কার এটা?

আবার কার? যে চালাচ্ছে তার, বাঁ দিকে মোড় ঘুরে শরৎ বলল, শুধু গাড়ি কিনেছি নাকি? বম্বেতে এর মধ্যে একটা বাড়িও করে ফেলেছি।

দেবদত্ত শরতের পিঠ চাপড়ে বলল, বাঃ বেশ কাজের ছেলে তো তুই!

শরৎ দেবদত্তর দিকে বাঁ হাতে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কোথায় যাবি এখন? কাজ আছে নাকি?

না। বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম।

চল কোথাও বসে চা খেতে খেতে গল্প করা যাক। অনেক দিন পর দেখা হল তোর সংগে।

সিগ্রেটে টান মেরে নির্বিকারভাবে দেবদত্ত বলল, যেখানে খুশি চল।

চৌরঙ্গীর এক নির্জন রেস্তোরাঁয় বসে শরৎ অনেকক্ষণ ধরে নিজের কথাই বলে গেল শুধু।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নাম করেছে।

আরও টাকা করবে।

আরও নাম করবে।

হয়েছে কি এখন। এই তো সবে শুরু। গায়ক সম্পর্কে লোকের ধারণা বদলে দেবে শরৎ। তারা দেখুক শুধু গান গেয়ে কি-না করা যায়!

বাড়ির লোকের কাছ থেকে সে কম কথা শুনেছে নাকি মাত্র কিছু দিন আগে! যে কোন আপিসে আজে-বাজে কাজ নেবার জন্যে বলতে বলতে তার মা-বাবা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তার।

কিন্তু শুধু গান গাওয়া ছাড়া আর কিছু শরৎ কখনও করে নি। হয়ত করতে পারত না।

আজ সে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে প্রত্যেককে। বাবার দেনা শোধ করেছে, মা'র গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, বোনের বিয়ের সব খরচ দিয়েছে, ভাইদের ভাল ইস্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখাচ্ছে।

আজ শরতের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

বম্বে থেকে কলকাতায় সে বেড়াতে আসে নি। প্লেন ভাড়া দিয়ে তাকে এখানে গান গাওয়াবার জন্যে আনা হয়েছে। পর পর তিন দিন তাকে সংগীত সম্মেলনে গান গইতে হবে।

কিন্তু কি করে তার এখানে আসবার কথা জানতে পারল দেশের লোক সে বুঝতে পারে না। কত লোক যে যায় তার বাড়িতে ঠিক নেই।

কেউবলে ফিল্মে মিউজিক ডিরেকসন্ দিতে হবে। কেউ প্লে-ব্যাক করবার অনুরোধ করে। রেকর্ড কোম্পানির লোকেরা বিরক্ত করে সারাদিন। আর ব্ল্যাঙ্ক চেক বই পকেটে নিয়ে নানা জাতের নানা বয়সের লোক তাকে স্নান খাওয়া করবার অবসর দেয় না।

বিশ্রাম করবে কখন শরৎ!

তার গর্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেবদত্ত হেসে বলল, খুব খুশি হলাম শুনে। তুই বেশ সুখে আছিস্ বল্?

সে কথার কোন উত্তর দিল না শরৎ।

সেই রেস্তোরাঁয় পিয়ানো আর বেহালা মিলিয়ে একটা সাধারণ বিলিতি সুর বাজছিল তাঁ শুনতে শুনতে টেবিলে তাল দিয়ে বলল, বাঃ, বেশ বাজাচ্ছে তো! একটা হিন্দি ছবিতে কায়দা করে চালিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকা পাওয়া যায়।

আর কত টাকা করবি? অনেক তো করেছিস্?

কোথায় অনেক! অবাঙালি মিউজিক ডিরেক্টাররা আমার চেয়ে চার গুণ বেশি টাকা করে ফেলেছে এর মধ্যে। আমিই তো একমাত্র বাঙালি আছি ওখানে।

দেবদত্ত ব্যঙ্গ করে বলল, বাঙালির গৌরব বল?

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর ধরতে পারল না শরৎ।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে দামি সিগ্রেটের কেস্ দেবদত্তর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই কি করছিস্ আজকাল?

নির্বিকারভাবে দেবদত্ত বলল, কিছুই না। আগে যা করছিলাম্ এখনও তাই করছি।

তার মানে?

বাড়িতে বসে আপন মনে গান গাইছি।

সে কি? অবাক হয়ে শরৎ বলল, অমন গলা তোর! এখনও ফিল্মে চান্স পাস নি?

কোথায় আর?

তাহলে কি করছিস্ তুই কলকাতায় বসে?

দেবদত্ত বলল, আমার মনের মত গান গাইতে দিলে মাঝে মাঝে রেডিওতে গাই আর ছাত্র-ছাত্রী আছে দু একজন—

ব্যস্, বাধা দিয়ে শরৎ বলল, শুধু এই করে ভুগে মরছিস্ তুই? ও করে আর কত পাস বল?

তা ছাড়া আর কি করব?

হালকা হাসি হেসে শরৎ বলল, গায়কদের আর সেদিন নেই রে দেবু, দেখছিস তো আমাকে?

তা তো দেখছি।

যেন ইচ্ছে করলেই দেবদত্তর সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে

এমন মুখের ভাব করে শরৎ বলল, ঠিক আছে আমি তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করব।

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, কি ব্যবস্থা ?

ফিল্মে কাজ পাবার। আমার কথায় লোকের আজকাল কাজ হয় রে !

ব্যাপারটা এতক্ষণ পর বুঝতে পেরে দেবদত্ত বলে উঠল, আমার জন্যে কিছু চেষ্টা করিস্ না। আমি এখন চাকরি করতে পারব না।

চাকরি মানে? পাঁচজন খাতির করবে তোকে। নবাবের মত থাকবি। বিশেষ কিছু না করে মাসে মাসে ঘরে বসে মোটা টাকা পাবি। তা ছাড়া আর পাঁচ জায়গা থেকে উপরি পাওনা তো আছেই।

দেবদত্ত হেসে বলল, তোরা তো করছিস ওসব, এক মিনিট কি ভেবে সে বলল, পরের কথা মত গান নিয়ে আমি খেলা করতে পারব না।

আমরা কি খেলা করছি নাকি ?

দেবদত্ত দৃঢ়স্বরে বলল, তা ছাড়া আর কি করছিস্ ? টাকার দিকে চোখ রেখে পরের নির্দেশ মতো গলা বেচছিস্—

বাধা দিয়ে শরৎ বলল, খুব অন্যায় করছি নাকি ? জেনে রাখিস ইচ্ছে করলেই লোকে আমার মত হতে পারে না।

দেবদত্ত হেসে বলল, তুই রেগে যাচ্ছিস কেন ? তোকে চটাবার জন্যে আমি তো কিছু বলি নি। টাকা রোজগার করতে হলে যা করতে হয় তুই তাই করছিস্।

নিশ্চয়ই, তা ছাড়া আর কি করব ?

কি করবি সেটা আমার বলবার কথা নয়। তবে আমার মনে হয় তুই শুধু টাকাই করেছিস্, গায়কদের সম্পর্কে লোকের ধারণা কতটুকু বদলাতে পেরেছিস্ জানি না।

জানিস্ না মানে ?' শুধু গান গেয়ে আর ছবিতে সংগীত পরিচালনা করে গাড়ি বাড়ি করতে পারলে গায়কদের সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলায় না ?

গায়ক গরিব কি বড়লোক সে কথা ভেবে কার কি এলো গেল ? গায়ক সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা তার গান। একটু থেমে মৃদু হেসে দেবদত্ত বলল, তোর টাকা আছে কিন্তু গান কোথায় গেল শরৎ ? প্রথম জীবনে অভিনব সুর সৃষ্টি করে তুই লোকের মনে যে রেখাপাত করেছিলি আজ কিছুতেই আর তা করতে পারবি না। তাই আজ ঐশ্বর্য দিয়ে তুই তোর সৃষ্টির দৈন্য ঢেকে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করিস্।

শরৎ আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, সৃষ্টির দৈন্য বলতে কি বুঝিস্ তুই ? আমি কি নতুন কিছু করছি না ?

হেসে দেবদত্ত বলল, বিদেশি গানের সুর ভাঙিয়ে নতুন কিছু করবার নামে স্রেফ চুরি করছিস, শরতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে সে বলল, গোলামি করলে স্বাধীন চিন্তা করা রীতিমত কঠিন সেকথা তো সকলেই জানে।

দেবদত্তর কথা শুনে নিস্তেজ গলায় শরৎ বলল, সুযোগ পেলেই আবার স্বাধীন চিন্তা করব—

বাধা দিয়ে দেবদত্ত বলে উঠল, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিলে সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না শরৎ। আর স্বাধীন চিন্তা করবার সুযোগ গ্রহণ করতে তোরও ইচ্ছে করবে না কারণ তুই সব চেয়ে আগে লাভের কথা ভাববি।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না শরৎ। নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে লাগল। দেবদত্তর কথা মুখ বুজে মেনে নিতে চায় না সে। অথচ কি বলবে সহসা ভেবে ঠিক করতে পারছে না।

তুই কি বলিস্, শরৎ সিগারেট দাঁতে চেপে থেমে থেমে বলল, বোকার মত উপোস করে গায়কদের দিন কাটান উচিত ?

দেবদত্ত বলল, বোকারা উপোস করে কিনা আমার জানা নেই তবে গায়করা ইচ্ছে করলে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিয়ে তাদের সম্পর্কে সত্যি লোকের ধারণা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

যথা ?

একটু ভেবে দেবদত্ত বলল, গায়ক সম্পর্কে যদি লোকের ধারণা বদলায় তাহলে তাঁর গান শুনেই বদলাবে। গাড়ি বাড়ি দেখে নয়।

শরৎ উত্তর দিল না। ঘন ঘন সিগ্রেট টানতে লাগল। একটু উসখুস করতে লাগল। বোধহয় এখন উঠতে চায়।

তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে নাকি শরৎ ?

হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।

চল তাহলে ওঠা যাক। আবোল তাবোল বকে শুধু শুধু তোর দেরি করিয়ে দিলাম।

না। কিছু না, বিল চুকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শরৎ বলল, তোর মাথায় পোকা ঢুকেছে। আজে বাজে ভাবনা ভেবে তুই শুধু ভুগে মরবি—

হালকা হাসি হেসে দেবদত্ত বলল, সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়ে রাজা হয়ে একা বেঁচে থাকবার চেয়ে অনেকের সংগে ভুগে মরতেই চাই শরৎ,—একটু চুপ করে থেকে ও আবার বলল, আর যদি বেঁচে যেতে পারি তাহলে বুঝলি, অনেককে নিয়েই বাঁচব।

শরৎ হেসে বলল, তোর বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি দেবু। আমরা তোর মত ভাবনা ছেলেবেলায় ভাবতাম।

দেবদত্ত বলল, আমার মনে হয় তোর শুধু ভাবনা চলে গেছে কিন্তু মনে মনে এখনও ছেলেমানুষ আছিস্।

কেন ?

সেকথা আর একদিন বলব। আজ অনেকদিন পর তোর সংগে দেখা হল, এতক্ষণ শুধু তর্ক করে কাটালাম।

রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে শরৎ বলল, কেউ যদি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজে ভোগে আর বাড়ির লোককে ভোগায় আমি তো তাকেই ছেলেমানুষ বলব—

তা বলবি বটে কারণ তুই নিজে ভুগছিস্ না, বাড়ির কাউকেও ভোগাচ্ছিস্ না। কিন্তু সত্যি যদি গায়কদের সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলাতে চাস্ তাহলে একটু না ভুগলে তো চলে না শরৎ।

ও রকম অনেক কষ্ট আমি করেছি। মনে নেই কী কষ্ট আমি করেছি নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে? এখন তুই আমাকে কথা শোনাচ্ছিস্, কিন্তু আমি বম্বে গিয়ে এমন চাকরি না করলে আমার বাড়ির লোককে হয় তো খুঁজে পাওয়া যেত না।

জানি, দেবদত্ত হেসে বলল, তাই তোর ওপর আমার কোন রাগ নেই। আমরা সকলেই দোটানার মধ্যে আছি। আত্মীয়-স্বজন আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে তাই আমরাও তাদের কথা ভেবে শুধু টাকার দিকে চোখ রাখি—

শরৎ অন্য দিকে চলে গেল। কোথায় কি কাজ আছে তার।

দেবদত্ত ট্রাম ধরল।

বৃষ্টি আর নেই তখন। হাওয়ার গতি কমে গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডায় নিঃঝুম হয়ে আছে চারপাশ।

দেবদত্তর শীত লাগল হঠাৎ।

বাড়ি অনেক দূর।

শুধু তারাময়ী তখনও জেগে ছিলেন।

রোজই জেগে থাকেন। দেবদত্তর ফিরতে যত দেরি হোক না কেন, ছেলেকে না খাইয়ে তিনি নিজে খেতে পারেন না।

এই নিয়ে প্রায়ই ছেলের সংগে তাঁর তর্ক বাধে।

আস্তে আস্তে দেবদত্ত বাড়ি ঢুকল।

সতী ঘুমিয়ে পড়েছে। ভবতোষ বাবুও জেগে নেই। শুধু তারাময়ী হাতে একটা বই নিয়ে বসে আছেন।

দেবদত্তকে দেখে তারাময়ী চমকে উঠে বললেন, শুধু একটা পাতলা পাঞ্জাবি পরে এই সময় বাইরে বেরোস্, অসুখ করবে যে রে দেবু—

দেবদত্ত হেসে বলল, আমার শীত লাগে না।

আপন মনেই যেন তারাময়ী বললেন, উনি আবার শালটা গায়ে দেন। সতীকে এত করে বলছি তোকে একটা গরম জামা বুনে দিতে—তা মেয়ে কথা কানেই তোলে না।

দেবদত্ত বলল, আমি পুলওভার গায়ে দিতে পারব না। ব্যস্ত হবার কিছু নেই মা, কলকাতায় আবার শীত পড়ে নাকি?

কি জানি, গজগজ করতে লাগলেন তারাময়ী, তোদের ব্যাপার কিছু বুঝতে পারি না।

দেবদত্ত হেসে বলল, ভাত বাড়। আমি এক মিনিটে মুখ ধুয়ে আসছি। খুব কম ভাত দিও আমাকে—

কেন?

শরতের সংগে অনেক খেয়েছি একটু আগে।

শরতের নাম শুনে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল তারাময়ীর তিনি আর কথা বললেন না। জায়গা করে থালা নামাতে লাগলেন।

মায়ের মুখের ভাব পরিবর্তন দেবদত্তর দৃষ্টি এড়াল না। কথায় কথায় তিনি তার উদাহরণ দেন কি না। শরৎ অত টাকা করল আর তাঁর ছেলে কিছুই করতে পারল না।

এ কম দুঃখ নাকি তারাময়ীর!

মুখ ধুতে ধুতে দেবদত্তর মনে হল আজ সত্যি একটু শীত

পড়েছে। এমন ঠাণ্ডা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রাস্তায় বার হওয়া আর উচিত নয় তার।

সতী কানে তুলেছিল বৈকি তারাময়ির কথা। দেবদত্তকে বলেছিল উল্‌ কেনবার জন্যে কয়েকটা টাকা দিতে। কিন্তু এখন চট করে উলের দাম বের করে দেয়া সম্ভব নয় দেবদত্তর পক্ষে। এ মাসে তার হাতে টাকা একেবারে নেই বললেই চলে।

নিজের খরচ চালিয়ে সংসারে কিছু সাহায্য করবে বলেই সুনন্দাকে গান শেখাতে রাজি হয়েছিল সে। সুনন্দার কথা মনে হতেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল আবার। এই কারণে মোটা টাকা দিতে চাইলেও সকলকে সে গান শেখাতে চায় না।

সখ মেটাবার কাজে যারা সাহায্য করে করুক, দেবদত্ত কোন দিনও ওসব করতে পারবে না।

খেতে বসে তারাময়ী বললেন, আজ আবার ওঁর সংগে সতীর একচোট হয়ে গেল।

অমন প্রায়ই হয়। তাই দেবদত্ত বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, কেন?

সেই ছোকরাটার সংগে উনি আজও বোধহয় সতীকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলেন, ডালের বাটি দেবদত্তর দিকে ঠেলে দিয়ে তারাময়ী বললেন, সতী আটটার পর বাড়ি ফিরতেই উনি কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন এত দেরি হল কেন?

একেবারে চুপ করে থাকা হয় তো ভাল দেখায় না তাই দেবদত্ত বলল, সতী কি বলল?

বলবে আবার কি, চাকরি করলে মেয়েদের যেমন উগ্র স্বভাব হয়, ওর স্বভাব তো তেমনি হয়েছে—

দেবদত্ত হেসে বলল, চাকরি করলে মানুষের মেজাজ খারাপ

হয় বুঝি? তাই বোধহয় আমার মেজাজ এত ভাল, একটু থেমে দেবদত্ত বলল, চাকরি করিনা কি-না!

এবার তুই একটা কিছু কর দেবু, তারাময়ী দুঃখ প্রকাশ করলেন, এমন করে আমি তো আর চালাতে পারি না—

এইবার সতীর প্রসংগ চাপা পড়ে যাবে। তারাময়ী দেবদত্তকে সংসারের টানাটানিব কথা প্রাণপণে বুঝিয়ে তার মন টলাবার চেষ্টা করবেন।

অর্থাৎ একটা চাকরি নিয়ে সে সংসারে কিছু সাহায্য না করলে তারাময়ীর পক্ষে দিন চালানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেই চললেন, আপিসে কাজ করতে না চাস না করলি, কিন্তু গানের নানা রকম কাজ তো লোকে পাচ্ছে আজকাল। ওই শরতকেই দেথ না, চোখের সামনে সে কোথায় উঠে গেল—

দেবদত্ত বলল, শরতের সংগে কথা বলব এক সময়।

একটু বিরক্ত হলেন তারাময়ী, তুই শুধু কথা বলেই খালাস। আর কিছুই করতে পারবি না। গ্রামফোন কোম্পানিতে যাবি না, রেডিওতে গেলে তোর মান যায়, ফিলিমে কাজ নিবি না—তাহলে কি করবি তুই বল?

দেবদত্ত উত্তর দিল না। মা'র কথার উত্তর সে এর আগে বহুবার দিয়েছে। তারাময়ীও বুঝতে পারেন ছেলে তাকে কি কথা বলবে।

তাই দেবদত্তর উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি বললেন, তোর বাবাকে একটু বিশ্রাম করবার অবসর দে। যা হয় এবার একটা কিছু কর—

দেবদত্ত সংক্ষেপে বলল, চেষ্টা করব।

ছাই করবি। রোজই তো ও কথা বলিস—

দেবদত্ত বলল, আমি যা রোজগার করি সবই তো তোমার হাতে দি। আমার জন্যে আর এমন কি বেশি খরচ হয় তোমাদের?

স্বার্থপরের মতো কথা বলিস কেন? শুধু তোর নিজের খরচ দেবার কথা কে বলেছে? আর কেউ কি নেই এ বাড়িতে? সতীকে চাকরি করতে হচ্ছে কেন?

দেবদত্ত হেসে বলল, সতী লেখাপড়া শিখেছে, তোমরা এক্ষুনি ওর বিয়েও দিতে পারছ না। বাড়িতে বসে না থেকে চাকরি করে সে তো ভালই করছে।

শব্দ করে মাছের ঝোলের বাটিটা দেবদত্তর দিকে সরিয়ে দিয়ে তারাময়ী বললেন, লেখাপড়া শিখে ভারী বাহাদুরি করেছে মেয়ে! তোকে কে লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিতে বলেছিল?

আমার হল না তো কি করব, ভাতের গ্রাস হাতে নিয়ে দেবদত্ত বলল, ফেল করার চেয়ে পরীক্ষা না দেওয়া ভাল। গান গাওয়া ছাড়া অন্য কোনদিকে মন দিতে পারলাম না তো কি করব বল?

গান গেয়ে দু পয়সা কর। আর কি করবি? সকলের পয়সা হচ্ছে, শুধু তোর দেখছি কিছু হয় না।

দেবদত্ত হাসল, হবে, হবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারাময়ী বললেন, আর হয়েছে! বোনের টাকা সংসারে লাগছে বলে তোর লজ্জা হওয়া উচিত। তিনি আপন মনে বললেন, চাকরি করা মেয়ের কখনও কি ভাল বিয়ে হয়? সতীর বিয়ের চেষ্টা করাও তো তোর দ্বারা হয় না। এমন ছেলে ভূ-ভারতে দুটি দেখিনি বাপু!

নিচেই দেবদত্তর ঘর।

খাওয়া সেরে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

বাড়িতে তাকে প্রায়ই এমন কথা শুনতে হয়। ভবতোষ বাবুও তাকে এমন কথা অনেকবার শুনিয়েছেন—অনেক বুঝিয়েছেন। এখন বিশেষ প্রয়োজন না হলে তার সংগে একেবারেই কথা বলেন না।

শীতের কনকনে হাওয়ায় দেবদত্তর স্যাঁতস্যাঁতে ঘর আরও বেশি ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

গ্রীষ্মকালে এমন আরাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঘরে হাওয়া খেলবার যদিও কোন উপায় নেই তবু ঘর এমন ঠাণ্ডা যে পাখা না চালালেও কোন অসুবিধা হয় না।

আর তেমনি ঠাণ্ডা লাগে শীতকালে!

আলো জ্বালল দেবদত্ত।

না, চিঠিপত্র আজ আর কিছু আসে নি। টেবিল একেবারে খালি।

তার ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নেই। একটা সাধারণ খাট, গোটা দুই চেয়ার আর ছোট একটা টেবিল।

আলাদা বসবার কোন ঘর নেই বাড়িতে। দেবদত্তর বন্ধুবান্ধব এলে সটান এই ঘরেই চলে আসে।

নিচে দুটো ঘর। মা বাবা থাকেন ওপরে। তার পাশের ঘরে থাকে সতী। দুই ঘরের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। ভবতোষ বাবুর কাছে কেউ এলে তাঁদের বসবার জন্যে সেখানে বেতের দুচারটে চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে।

রান্নাঘরের পাশে বারান্দায় খাওয়া হয়।

আজকের দরে বাড়ি ভাড়া নিতে হলে ভবতোষ বাবুর পক্ষে এত বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না। যখন এ বাড়ি নিয়েছিলেন তখন ভাড়া ছিল চল্লিশ টাকা। এখন বাড়িওলা অনেক চেষ্টা করেও পাঁচ টাকার বেশি ভাড়া বাড়াতে পারে নি।

কিন্তু বাড়িওলা শোধ নিয়েছে অন্যভাবে।

চুনকাম করে দেয়া দূরের কথা, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়লে, চিৎকার করে বাড়িওলাকে জানালে কোন কথা কানে তোলে না সে।

তেমন প্রয়োজন হলে ভবতোষ বাবুকে নিজেই পয়সা খরচ করে বাড়ি সারাবার চেষ্টা করতে হয়।

কিন্তু মেরামত করাবার প্রয়োজন সাংঘাতিক রকম হলেও হাত পা গুটিয়ে অসুবিধা সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করবার উপায় থাকে না ভবতোষ বাবুর।

মিস্তিরিরা যা দর হাঁকে তা শুনে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। তখনই অগত্যা তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে দেবদত্তর ওপর। কোন ক্ষমতা নেই তার।

এমন বেকার ছেলের বাপ বলে নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দেন তিনি।

ভবতোষ বাবুর আশা ছিল ছেলে একদিন বড় হবে—মানুষ হবে। তার বিয়ে দিয়ে সংসারের অনেক ভার লাঘব করবেন তিনি। কিন্তু সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে ভবতোষ বাবুর। এমন কি, কোথাও ছেলের নামোচ্চারণ করতে এখন লজ্জা বোধ হয় তাঁর!

এমন স্বার্থপর অবুঝ ছেলে না থাকলে কি ক্ষতি হত তাঁর!

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ এক সংগে এত কথা দেবদত্তর মনে হল।

বিছানা ঠিক করে তানপুরাটা খাটের ওপরে রেখেছে সতী। স্বরলিপির বইগুলোও গুছিয়ে রেখেছে বোধ হয়।

মেয়েটা এত সময় পায় কখন?

তারাময়ীও অবশ্য মাঝে মাঝে এসে দেবদত্তর ঘরে এটা ওটা

গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন জিনিষপত্র এদিক ওদিক করা ছেলে পছন্দ করে না।

মাকে স্পষ্ট বারণ করে দেয় তার ঘরের কোন কিছুতে হাত না দিতে। তাই আজকাল তারাময়ী বড় একটা ঢোকেন না তার ঘরে। দেবদত্তকে কিছু বলবার দরকার হলে খাবার সময় গড়গড় করে বলে যান।

আজ যেমন বললেন।

দেবদত্ত বিছানার ওপর থেকে তানপুরাটা সরিয়ে ছোট টেবিলের ওপর সাবধানে রাখল। ভাবল একটু বিশ্রাম করে একটা নতুন সুর ঝালিয়ে নেবে।

কিন্তু গায়ক হিসেবে এ বাড়িতে তার চলা ফেরা অনেক সংযত হয়ে গেছে। ইচ্ছে মতো সে সুর ভাঁজতে পারে না। সময়ে অসময়ে গলা ছেড়ে গাইতেও তার বেধে যায়।

সে বুঝতে পারে এ বাড়িতে গায়ক হিসেবে তার কোন স্বীকৃতি নেই। কারণ পাঁচ জায়গা থেকে ডাক আসে না তার, লোকের মুখে মুখে তার গাওয়া গানের চলন নেই।

সব চেয়ে বড় কথা, গান গেয়ে পয়সা-কড়ি দেবদত্ত এমন কিছুই পায় না। কাজেই কি দেখে তার প্রতিভা স্বীকার করবে বাড়ির লোক?

শুধু মা বাবার কথা বললে চলবে কেন, বাইরের লোকের কাছেও দেবদত্তর পরিচয় একজন সাধারণ বেকার যুবক ছাড়া আর কিছু নয়।

যাহোক, বাইরের লোক ভাবুক যা খুশি, তাতে আজ দেবদত্তর কিছু এসে যায় না। কিন্তু যে বাড়িতে সে বাস করে, সে বাড়ির লোক যদি তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে ব্যর্থ হয়

আর দেবদত্ত তাঁদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে বলাই বাহুল্য, সঙ্কোচে মন ভরে যেতে খুব বেশি দেরি লাগে না তার মতো মানুষের।

বেড কভার সরিয়ে পায়ের ওপর লেপটা টেনে নিয়ে খাটে ঠেস দিয়ে দেবদত্ত বসে পড়ল।

রান্না ঘরে থালা বাটি নাড়া চাড়া করবার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। এঁঠো বাসন ওখানে অমনি পড়ে থাকবে সারারাত। কাল খুব ভোরে এসে কড়া নাড়বে ঠিকে ঝি। মা নিজেই হয়তো দরজা খুলে দেবেন। খুব ভোরে ওঠেন তিনি। কোনদিন ঘুম ভাঙলে সতীও দরজা খুলে দেয়। মাকে সে সংসারের কাজে সাহায্য করে।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে। রাত অনেক হবে! আজও ঘড়ি কেনবার অবসর হয় নি দেবদত্তর। বাড়ির হাল চাল দেখে সে আন্দাজে সময় ঠিক করে নেয়।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় মা রান্না ঘরের দরজা খোলেন। সাতটার আগেই বাবার চায়ের কাপ ওপরে পৌঁছে দেওয়া চাই।

সাড়ে আটটার মধ্যেই স্নান সারা হয়ে যায় সতীর। বাবা কলঘরে ঢোকেন নটা বাজবার কিছুক্ষণ আগে।

ঠিক নটার সময় পাশাপাশি বাপ আর মেয়ে খেতে বসে।

তারপর একটু আগে পরে দুজনে আপিস যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বার হয়। এক সংগেই হয় তো দুজনের বেরোনো উচিত কিন্তু দেবদত্তর মনে হয় বাবাকে এড়াবার জন্যে ইচ্ছে করেই সতী একটু আগে-পরে বার হয়।

কেন দেবদত্তর একথা মনে হয় কে জানে!

বাড়ির মধ্যে এখন আর কোন সাড়া শব্দ নেই। বাইরেও লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়।

শীতের টালিগঞ্জ একটু তাড়াতাড়ি নিঝুম হয়ে যায়। দূরে এক সুরে একটা কুকুর শুধু চিৎকার করে চলেছে। ট্রামের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

দিনের বেলা বাড়ি থাকলে ট্রাম-বাসের আওয়াজ একেবারেই শুনতে পায় না দেবদত্ত। কিন্তু যখন রাত বেড়ে চলে আর তার ঘুম আসে না, গানের সুর নিয়েও পরীক্ষা করতে ইচ্ছে করে না তখন যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টির টুকরো টুকরো প্রমাণ এক আশ্চর্য ছন্দের মধ্যে দিয়ে তার কানে এসে পৌছয়। মনে অনুরণন তোলে। আর সেই ছন্দের রেশ মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ গুঞ্জন করে ফেরে দেবদত্তর। সে কান পেতে থাকে। মনে হয় কিছুক্ষণ ট্রাম লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

পাশের বাড়ি থেকে টুং-টুং করে ঘড়ির সুর বাজে। বালতির ঝন ঝন শব্দ হয়। কার কাশি শোনা যায়। টিউবওয়েল থেকে জল ভরা হয়। কোন মেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বেড়াল তাড়ায়!

ভেতরে বাইরে যন্ত্রে প্রকৃতিতে কেমন এক অদ্ভুত সুরের সামঞ্জস্য খুঁজে পায় দেবদত্ত।

তবু টেবিলের ওপর তানপুরা তেমনি পড়ে থাকে। ঘরে আলো জ্বলে আর খাটের ওপর সে নিজে তেমন করেই বসে থাকে।

হঠাৎ উঠে তাল কেটে দিতে ইচ্ছে করে না তার।

অকারণ বেদনায় তার মন ভরে যায়।

এই সুর, এই ছন্দ, একটা উৎকট বেসুরো রাগিনী বাজিয়ে কে যেন সর্বক্ষণ গোলমাল করে দেয়। বোধ হয় দিনের বেলা তাই এমন করে নিজেকে খুঁজে পায় না দেবদত্ত। সুরের সামঞ্জস্যও ধরতে পারে না। সারা দিন সেই বেসুরো রাগিনীর তালে তাল মিলিয়ে তাকে চলতে হয়।

একটা চাপা অস্বস্তিতে তার সারা মন ভরে থাকে।

খুব সাবধানে ঠক ঠক করে কে দেবদত্তর দরজায় আঘাত করল। সে উঠে দরজা খুলে দেখে চোরের মত সতী দাঁড়িয়ে আছে।

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে তার। বাপের সংগে ঝগড়া করে মেয়েটা আজ রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করেছে কি-না কে জানে!

দেবদত্ত বলল, এখনও ঘুমোস নি যে? কি ব্যাপার সতী?

সতী ঘরে ঢুকে দেবদত্তর খাটের ওপর বসে পড়ল।

কোন ভূমিকা না করে দাদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সটান বলল, আমি এ বাড়িতে আর থাকতে পারব না দাদা—

দেবদত্ত হেসে জিজ্ঞেস করল, কেন? কার ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যাবি তুই? যাবিই বা কোথায়?

থাকবার জায়গার অভাব হবে না। কিন্তু এ সংসারে মাসে মাসে টাকা জুগিয়ে খোঁটা খেতে আমি পারব না। যাদের জন্যে দায়ে পড়ে চাকরি করছি তারাই দিনরাত যা-তা অপমান করে বোঝাচ্ছে চাকরি করাটা যেন আমার মস্ত অপরাধ।

তা বলে বাড়ি ছেড়ে যাবি তুই? কি জ্বালায় জ্বলে বাবা তোর ওপর রাগ করেন বুঝতে পারিস না?

না। অত বুদ্ধি আমার নেই, সতীর চোখ জলে ভরে উঠল আবার, কি ধার ধারি আমি এ বাড়ির? আমি কচি খুকি নই যে দিনরাত আমাকে আগলে রাখতে হবে, একটু থেমে সতী বলল, আর তাই যদি রাখতে চাও তাহলে আমি চাকরি করছি কেন?

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, হয়েছিল কি? তপনের সংগে বাবা আবার কোথাও তোকে দেখেছেন নাকি?

সতী রেগে বলল, কি জানি? আমি কি পর্দানশিন জানানা যে বোরখায় মুখ ঢেকে আপিস যাব আর বাড়ি আসব? আমার সামান্য স্বাধীনতা থাকবে বৈকি!

দেবদত্ত বলল, নিশ্চয়ই থাকবে। তুই-ই বা রাগ করে না খেয়ে উঠে যাস কেন? ওসব কথায় কান না দিলেই তো হয়—

যতক্ষণ বাড়ি থাকব শুধু কথা শুনতে হবে। আমার বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই বলে আমার অসংখ্য দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করতে হবে।

সব যখন বুঝিস তখন মিছে মন খারাপ করিস কেন? ওঁরা নিজেরা মনে মনে জ্বলছেন বলেই না তোর ওপর রাগ ঝাড়েন। একটু চুপ করে থেকে সতীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেবদত্ত বলল, বিয়ে না করে মেয়ে যদি চাকরি করে তাহলে বাপ-মার মনে কষ্ট তো হবেই—

সতী দেবদত্তর কথার কোন উত্তর দিল না।

এসব কথা বুঝে মাথা ঠাণ্ডা রাখবার মতো মনের অবস্থা তার নেই। এ বাড়ি ছেড়ে মেয়েদের কোন হস্টেলে থেকে সে এঁদের বুঝিয়ে দিতে চায় এ সংসারে তার মূল্য কতখানি।

মুখ বুজে সে যত সহ্য করে, সকলে তত যেন পেয়ে বসে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সতীকে খুশি করবার জন্যে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, তপন কেমন আছে রে সতী? আজকাল আমার সংগে আর দেখা করে না কেন?

সতী একটু শান্ত হয়ে বলল, হঠাৎ খুব কাজ পড়েছে। তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।

দেবদত্ত হেসে বলল, তোদের প্রায়ই দেখা হয় বুঝি?

হ্যাঁ!

বিয়ের কিছু ঠিক করেছিস?

সতীর মাথাটা একটু নিচু হয়ে গেল। দাদা এমন ছেলেমানুষের

মতো প্রশ্ন করে যে উত্তর দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ঘর থেকে এখন পালিয়ে যেতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়!

বোধহয় তার মনের ভাব বুঝতে পেরে দেবদত্ত বলল, আর রাত করিস না। এবার শুতে যা। কথায় কথায় মাথা গরম করে আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে শরীর খারাপ করিস না।

দেবদত্তর কথা শেষ হবার সংগে সংগে বিনা বাক্যব্যয়ে সতী দরজা ঠেলে নিজের ঘরে চলে গেল।

দেবদত্ত হাসল মনে মনে। সতীর মেজাজ ঠাণ্ডা করবার মন্ত্র জানে সে। মেয়েটার জন্যে মায়া হয় তার। চাকরি করছে বলে নয়, বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যেতে পারছে না বলে।

কবে যে যেতে পারবে তা বোধহয় ও নিজেই জানে না।

চেহারা দেখে শান্ত ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে বলে মনে হয় বটে মানুষের, কিন্তু তেজ আছে সতীর। তা না হলে মা-বাবা তার বিয়ের চেষ্টা করতে গেলেই অমন বেঁকে দাঁড়াতে পারে কেমন করে। আর সতী যতই প্রবলভাবে আপত্তি জানায়, মা বাবা ততই বিপুল তর্কে তাকে কাবু করবার চেষ্টা করেন এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যে দু একবার মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা না করা হয়, তা নয়।

কিন্তু সতীকে তখন আর সারা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আসলে চাকরি করবার কথা দেবদত্তর, সতীর নয়। কিন্তু দাদার ওপর বোনের বিশেষ রকম টান আছে বলে আর নানা কারণে তপনকে এক্ষুনি বিয়ে করার বাধা আছে বলে সতীকে সদাগরি আপিসে আপাতত একটা কাজ নিতে হয়েছে।

তা না করলে অনটনের সংসারে আরও অসুবিধা বাড়ে।

কিন্তু এই কারণে ফল হল উল্টো রকম।

তারাময়ী লজ্জা লুকোবার জায়গা পেলেন না। তাঁদের বাড়ির

মেয়ে চাকরি করতে বার হলে পাড়ার লোককে যেন ডেকে ডেকে ঘরের দৈন্যের কথা জানানো হয়।

আর ভবতোষ বাবু ভাবলেন, মেয়েটার নিশ্চয়ই কোন মৎলব আছে। চাকরি করতে যাবার নাম করে সেই মিস্তিরিটার সংগে আড্ডা ইয়াকি দেবে।

ওদিকে বাড়তি টাকা আসতে লাগল সংসারে। না নিয়ে উপায় নেই বলে সতীর রোজগারের টাকা হাত পেতে নিলেন বটে তারাময়ী কিন্তু কথায় কথায় মেয়েকে খোঁটা মারতে ছাড়লেন না।

মেয়েটা বংশের নাম ডুবিয়ে ছাড়ল।

ভবতোষ বাবু সায় দিয়ে বললেন, এখন হয়েছে কি, ও মেয়ের জন্যে সর্বনাশ হবে তোমাদের—

ছুটির পর মাঝে মাঝে তিনি সতীর আপিসের দরজায় গা ঢাকা দিয়ে থাকেন। কৌশলে মেয়ের চোখ এড়িয়ে তার পেছন পেছন যান। কোন মৎলবে কি কাজ হাঁসিল করবার জন্যে মেয়ে চাকরি করছে তাঁকে জানতে হবেই।

তারপর দৈবদুর্বিপাকে রাস্তার এক ধারে কিংবা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যদি সতী তপনের সংগে সেইদিনই দেখা করে তাহলে তো কথাই নেই।

সতী ফিরলে বাড়ি মাথায় করেন ভবতোষ বাবু।

মেয়েকে নানাভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, নিজের স্বার্থের জন্যে সে চাকরি করছে। মা-বাপের মুখে চুনকালি মাথাবার মৎলব আঁটছে। তাছাড়া আর কোন কারণ নেই সতীর চাকরি করতে বের হবার।

মেজাজ ভাল না থাকলে গলার স্বর চড়িয়ে সতীও কথা কাটাকাটি করে।

না খেয়ে উঠে যায়।

মনের দুঃখে চোখের জল ফেলে।

তপনের এই মুহূর্তে তাকে বিয়ে করবার কোনই আপত্তি নেই। অবশ্য দোকানটা আর একটু জাঁকিয়ে তুলতে চায় সে। সতীকে সুখে রাখবার চিন্তা সারাক্ষণ করে বলেই একথা বলে তপন। তা না হলে এখুনি বিয়ে করতে আপত্তি হবে কেন তার। তপনের মতে সতীর মতো মেয়ে সারা পৃথিবীতে আর একটি মিলবে না।

একথা দশ-বারো বছর ধরে অনবরত শুনছে বলেই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে সতী।

নানা কারণে তপন খুব বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারে নি। তবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার অদম্য ইচ্ছায় সব সময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

ধর্মতলায় একটা ছোটখাট সাইকেলের দোকান খুলেছে সে। এবং সেই কারণেই ভবতোষ বাবু তাকে মিস্তিরি বলে উল্লেখ করেন।

মিস্তিরি হোক, কুলি হোক, চাষী হোক—নিজের ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে সতীর। কোন রাজপুত্রের সন্ধান এখনও তার জন্যে আনতে পারেন নি তার বাবা-মা। কাজেই তাঁরা তপনকে ছোট করলে সে মুখ বুজে থাকতে পারে না। এবং নিজেদের দম্ভ বজায় রাখবার জন্যে সতীর ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু জাত-কুল মিলিয়ে তাঁরা একটা কিম্ভূত পাত্রকে এনে হাজির করেন তখন কথা কাটাকাটি গোলমাল এড়াবার জন্যে এবং এমন যেন আর কখনও না করা হয় সেকথা বুঝিয়ে দেবার জন্যে সতী কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকে।

কোথায় থাকে কে জানে!

তখন মা-বাবার সমস্ত রাগ আবার নতুন করে গিয়ে পড়ে দেবদত্তর ওপর।

ছেলেটা বেকার বসে না থেকে সংসারের কথা ভেবে চাকরি করলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি কেমন করে হয় তা একবার দেখতেন তাঁরা!

নাঃ, দাদাটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! রোজ এই কাণ্ড করবে।

আলো জেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে দেবদত্ত। লেপ দিয়ে পা দুটো চাপা আছে শুধু।

তানপুরা তেমনি পডে আছে টেবিলের ওপর।

দেবদত্তর গায়ে ভাল করে লেপ চাপা দিয়ে আলো নিবিয়ে দিল সতী। তারপর ফিরে এল নিজের ঘরে।

ঘুমও আসে না ছাই।

রাত বেড়ে চলে।

আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বে দেবদত্ত।

কাল সন্ধ্যেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কোন কাজ সারা হয় নি।

অনিল আর অমিতার সংগে আজই দেখা করা দরকার। জলসার কথা আলোচনা করতে হবে।

শরতের সংগে আর একবার দেখা করলে বোধহয় ভাল হয়। কাল দুমদাম তাকে যা ইচ্ছে বলা ঠিক হয় নি তার।

বাড়ির যেমন অবস্থা তাতে দেবদত্তকে কোনদিন কি করতে হয়, কোথায় যেতে হয় বলা কঠিন। কিছু স্বাধীনতার ব্যবস্থা সত্যি যদি শরৎ করে দিতে পারে তাহলে না-হয় একবার ছবির ব্যাপারে চেষ্টা করা যায়।

যদি মতে না মেলে, ভাল না লাগে তখন আবার ফিরে এলেই চলবে।

দেখা যাক অনিল আর অমিতা কি বলে!

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শরতের সংগে দেখা করে নিজের কথা বলবার ভাবনা মন থেকে একেবারে দূর করে দিল দেবদত্ত।

মনে মনে নিজেই হাসল সে। শুধু অভাবের হাত এড়াবার চেষ্টা। শুধু ভয়। শুধু অস্বস্তি।

মুস্কিল হল এই যে এমন এক পরিবারে তার জন্ম যেখানে শুধু যোগ্য মূল্য পেলে খুশি হওয়া যায় না। যেমন করে হোক অনেক বেশি পেয়ে সকলের মুখে হাসি ফোটাতে হয়।

তাই প্রতিভার চেয়ে উপার্জন বেশি হওয়া চাই। আর উপার্জন বাড়াবার জন্যে যদি প্রতিভা খর্ব করতে হয় তাহলে আপত্তি হবে না কারুর বরং সকলে খুশি হবে।

সাধনা করে নয়, প্রতিভার প্রমাণ তাকে দিতে হবে উপার্জন দেখিয়ে।

মোটা খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি গায়ে দিতে দিতে দেবদত্ত ভাবল যদি সে চাষীর ছেলে হত তা হলে মনে এত অস্বস্তি থাকত না তার। মা বাবা কিছুই আশা করত না তার কাছ থেকে। সংসারের ঠাট বজায় রাখবার ভাবনাও থাকত না।

সে যদি গান গেয়ে শুধু একফালি কুমড়ো কি একটা লাউ কিংবা মোট চার আনা পয়সা পেত তাহলে তার জন্যে মা বাবা গৌরব বোধ করতো। আর প্রয়োজন হলে নিজেরা উপোস করে ছেলের সংগীত সাধনার নানা সুযোগ করে দিত। তার প্রতিভা সহজভাবে মেনে নিতে এতটুকু দ্বিধা হত না তাদের।

কিংবা সে যদি রাজার ছেলে হত বা রাজার মতো বিত্তশালী

লোকের পরিবারে জন্মাতো তা হলেও প্রতিভা বিকৃত করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবার জন্যে তাকে তাগিদ দিত না কেউ। কেননা সে উপার্জন করুক বা না করুক তাতে সংসারের কিছুই এসে যেত না।

সংসারের আর পাঁচজনের চেয়ে সে একটু অন্য রকম বলে সকলে তাকে বেশি সমাদর করত। আর গান গেয়ে সামান্য উপার্জন করতে পারলে তো কথাই নেই, বাড়ির লোকের মনে হত তার প্রতিভা স্বীকার করে লোকে যে মূল্য দিয়েছে তাই তো ঢের। কত মূল্য দিল আর তা দিয়ে সংসারের কোন অভাব মিটবে সে-হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাত না কেউ।

কিন্তু দেবদত্ত দুঃখী চাষীর ছেলে নয়, বিত্তশালী বংশের ছেলেও নয়, এ দুইএর মাঝে যে পরিবার সে সেখানকার মানুষ।

তাই অজান্তে কখন ভেজাল মিশে যায় তার সাধনায়।

বাবা খেতে বসেছেন। সতীও বোধ হয়। আপিসে যাবার সময় হয়েছে দুজনের। ঠিকে ঝি আজ আসেনি বলে মা আপন মনে গজগজ করছেন।

একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল দেবদত্তর বাড়ির সামনে। কে এলো? শরৎ নাকি?

আজ সকালে কাউকে বাড়িতে আসতে বলেছে বলে তার মনে পড়ে না।

সুনন্দাকে সংগে নিয়ে তারাময়ী দেবদত্তর ঘরে এসে বললেন, তোর কাছে এসেছে দেবু—

আরে, আসুন—আসুন! কি ব্যাপার?

সুনন্দা নমস্কার করে বলল, কালকের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেবার জন্তে এলাম। আপনি কি সত্যি ঠিক করেছেন আমাকে আর গান শেখাবেন না?

তারামরী সে-ঘরে আর দাঁড়ালেন না। খাওয়ার পাট চুকে যায় নি এখনও। সতী আর ভবতোষ বাবু বেরিয়ে না গেলে তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় হয় না।

দেবদত্ত ভাবতে পারে নি সুনন্দা তার বাড়িতে এসে হাজির হবে। তাই হঠাৎ সে ঠিক করতে পারল না কি উত্তর দেবে তার কথার।

কাল সন্ধ্যায় যে দম্ভ মনকে নাড়া দিয়েছিল আজ সকালে সুনন্দার আবির্ভাবে তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই।

দেবদত্ত হেসে বলল, শেখাব বলেই তো ঠিক করেছিলাম কিন্তু দেখলাম গান শেখবার সময় আপনার হবে না।

সুনন্দা বলল, আট দিন বাড়ি ছিলাম না বলে একথা আপনার মনে হল বুঝি?

বোধহয়।

তাহলে বিশেষ কাজ পড়লে আমি যখন কলেজে যেতে পারি না তখন কি প্রফেসারও মনে করেন আমার লেখাপড়া করবার সময় হবে না?

দেবদত্ত আবার হাসল, তা তো জানি না।

তবে কোন লজিক অনুসারে আপনি মনে করেন আমার গান শেখবার ইচ্ছে নেই?

আমি লজিক পড়ি নি।

আপনার ব্যবহার দেখে সে কথা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি।

আপনি কি আজ সকালে বাড়ি বয়ে আমার সংগে ঝগড়া করতে এসেছেন?

সুনন্দা বলল, মানুষকে অপমান করবার অধিকার কি শুধু আপনার একার?

'আমি তো কাউকে অপমান করি নি।

সকলের ধারণা সমান নয়, একটু চুপ করে থেকে সুনন্দা বলল, আমার শেখবার ইচ্ছে নেই—এমন একটা ভুল ধারণা নিয়ে আপনি আমাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করবেন সেটা আমার পক্ষে অপমানকর বৈকি! তাই আমি আপনার সংগে একটা ব্যবস্থা করতে এলাম।

বলুন?

আপনাকে আমাদের বাড়ি আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমিই আপনার এখানে গান শিখতে আসব—

এখানে?

হ্যাঁ, কোন অসুবিধা আছে?

আমার দিক থেকে নেই। তবে আপনার বোধ হয় অনেক অসুবিধা হবে।

সুনন্দা বলল, আমার কথা ভেবে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সেটা আমি বুঝব। যেমন ব্যবস্থা ছিল তেমনি থাকবে, শনিবার-রবিবার সন্ধ্যে ছটায় আমি আসব।

ঠিক আছে।

সুনন্দা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে এই শনিবার থেকেই আমি আসব। আজ চললাম।

তা কি হয়? বসুন! চা খেয়ে যান।

দেবদত্তর কথা শেষ হতে না হতেই তারাময়ী এক হাতে রসগোল্লার প্লেট আর এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, এই যে—

না না, মাপ করবেন। এইমাত্র অনেক খেয়ে আসছি। এখন কিছুই খেতে পারব না।

এই মিষ্টি দুটো—

মিষ্টি আমি একেবারেই খাই না।

দেবদত্ত বলল, তাহলে শুধু চা খান।

দিনে দু-কাপের বেশি চা খেলে ঘুম হয় না আমার, তারাময়ীর দিকে তাকিয়ে সুনন্দা হেসে বলল, আপনি শুধু শুধু কষ্ট করলেন—

কষ্ট আর কি, তুমি বরং না খেয়ে কষ্ট দিলে আমাদের।

এখন তো প্রায়ই আসব। তখন খেতে হবে বৈকি এক সময়। আচ্ছা দেরি হয়ে যাচ্ছে, অন্য কাজ আছে আমার—

দু-জনের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে সুনন্দা হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

চা আর রসগোল্লার প্লেট দেবদত্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে তারাময়ী বললেন, তুই তাহলে খেয়ে ফেল দেবু।

দাও!

মেয়েটি কে রে? বেশ বড়লোকের মেয়ে মনে হল যেন!

মার দিকে তাকিয়ে দেবদত্ত হেসে বলল, গাড়ি চড়ে যখন এসেছে তখন বড়লোকের মেয়ে বৈকি।

তুই ওকে গান শেখাবি বুঝি?

তাই তো ঠিক হল! এখানে এসে গান শিখবে।

কত মাইনে দেবে রে?

তিরিশ-চল্লিশ টাকা দেবে বোধ হয়।

খুশি হয়ে তারাময়ী বললেন, এমন দু-একজন ছাত্র-ছাত্রী পেলে তো ভালই হয়। এরা ঠিক ঠিক মাইনে দেবে। তোর কাছে অন্য যারা আসে তাদের চেহারা দেখে ভরসা হয় না রে দেবু—

দেবদত্ত হাসল, সকলের অবস্থা তো সমান নয়। তবে এর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাক মা, মাইনে দেবার জন্যে একেবারে হাত বাড়িয়ে বসে আছে।

সে আমি চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি, একটু থেমে তারাময়ী জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটির নাম কি রে?

সুনন্দা।

ব্রাহ্মণ?

দেবদত্ত হেসে বলল, তা তো জানি না। সুনন্দা রায়! কি হতে পারে বল না?

রায় তো সবই হতে পারে বাপু। তা যা-ই হোক, বেশ মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। ওর মতো ছাত্রী জোগাড় করবি। তাহলে তোর একটু-আধটু নাম-টাম হতে পারে মনে হয়।

আমি তো চেষ্টা করি সব সময়। জোটে না তা আর কি করব! দেবদত্ত হেসে একটা রুমাল ভরে নিল পকেটে।

অমিতাদের বাড়ি যাবার জন্যে এখুনি বেবিয়ে না পড়লে বেলা হয়ে যাবে অনেক।

সুনন্দার সংগে দেবদত্তর মতো গায়কের আলাপ হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ গানে সুনন্দাব তেমন ঝোঁক নেই, গায়ক সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই।

দেবদত্তর নাম সে যে শোনে নি তা নয়। এখানে ওখানে তার সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা হয়। সে নাকি নতুন ধরনের গান গেয়ে নাম করছে। তাই তার সম্বন্ধে একেবারে খবর না রাখলে পাঁচজনের সামনে অপদস্থ হবার সম্ভাবনা।

ঠিক সেই কারণেই দেবদত্তর নাম কানে পৌছেছিল সুনন্দার। কিন্তু ওইটুকুই। শহরের একজন প্রায় অখ্যাতনামা গায়ককে নিয়ে আর কোন ভাবনা একেবারেই করে নি সে।

তেমন শিক্ষা সুনন্দা পায় নি। এ সমাজে একজন গায়কের যে কোন মূল্য আছে সে কথা বোধ হয় সুনন্দার কোন আত্মীয় সহজে মানতে পারবে না।

সুনন্দা নিজে তো নয়ই।

সুনন্দার বাবা প্রমোদ বাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখন কলকাতায় থাকেন না তিনি। বর্ধমান আপাতত তাঁর কর্মস্থল।

মেয়েকে নিয়ে অলকা পণ্ডিতিয়া প্লেসের বাড়িতে থাকেন।

এর মধ্যে কলকাতায় একটা মাঝারি রকম বাড়ি করে ফেলেছেন প্রমোদনাথ। বেশি ভাড়া পাবেন বলে ওপরতলা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন।

মাঝে মাঝে স্বামীর সংসার গুছিয়ে দেবার জন্যে অলকা বর্ধমানে যান। সুনন্দাও যায়। আর প্রায়ই প্রমোদনাথ কলকাতায় আসেন। না বললেও চলে, এখানে বদলী হয়ে আসবার চেষ্টা করছেন তিনি।

যদি অলকাকে সুনন্দার বিয়ের ভাবনা না ভাবতে হত তাহলে হয়তো গোটা বাড়িটাই ভাড়া দিয়ে তিনি স্বামীর সংগে গিয়ে বসবাস করতেন।

কিন্তু সুনন্দার বিয়ে না হওয়া অবধি অলকার দিক থেকে সেটা করা নানা কারণে যুক্তিসংগত নয়। তিনি যেমন ছেলের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে চান, কলকাতায় থেকে নিজে চেষ্টা না করলে তেমন ছেলের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

সুনন্দা দেখতে ভাল। বি, এ, পাশ করেছে। কথায় বার্তায় রীতিমত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তবু মেয়েকে একটু আগলে রাখেন অলকা। সতর্ক করে দেন। নানা উপদেশ দিয়ে বোঝান, জীবনে সুখ পেতে হলে অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন। আর সমাজে খাতির পেতে হলে সব চেয়ে আগে পদমর্যাদার দিকে চোখ রাখতে হবে।

অলকা সাব-জজের মেয়ে এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী বলেই সরকারি চাকুরে ছাড়া অন্য কাউকে মনে মনে একেবারেই আমল দিতে পারেন না। এবং মেয়ের বিয়েটাও তেমন কোন তরুণ চাকুরের সংগেই দিতে চান।

তাই আগলে রাখলেও স্থান এবং পাত্র বুঝে সুনন্দাকে অবাধ স্বাধীনতা দেন তিনি। যেমন হীরেশের বেলায় দিয়েছেন।

ওপরের ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকে সুদেব দত্ত। রেলওয়েতে ভাল চাকরি করেন তিনি।

বাঙালীকে বাড়ি ভাড়া দেবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না অলকার। মাদ্রাজি ভাড়াটে চেয়েছিলিন তিনি। ওরা নাকি বেশি ভাড়া দেয় আর ছোটখাট অসুবিধা নিয়ে জ্বালাতন করে না বাড়িওলাকে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি তেমন কোন মাদ্রাজীকে হাতের কাছে পাওয়া গেল না বলেই সুদেব দত্ত ফ্ল্যাটটা পেল। রেলওয়ের লোক না হলে অলকার কাছে কিছুতেই সুবিধা হত না তার। ওরাও তো প্রায় সরকারি চাকুরে।

ওপরের ভাড়াটে সুদেব দত্তর ছেলে হীরেশ। ছত্রিশ জাতের সংগে পাল্লা দিয়ে সবকারি পরীক্ষায় পাশ করে দিল্লীতে চাকরি পেয়েছে।

মাদ্রাজীর বদলে বাঙালী ভাড়াটে পেয়ে শাপে বর হল অলকার। বলা বাহুল্য আদর-আপ্যায়নে হীরেশকে ঘরের ছেলের মতো করে তুলতে তিনি বিলম্ব করলেন না। পাকা কথা কারুর সংগে না হলেও আকারে-ইংগিতে বোঝা গেল আর কিছুদিন পর হীরেশের চাকরি একেবারে পাকা হলে সুনন্দার সংগে বিয়ে হবে তার।

স্ত্রীর ব্যক্তিত্বে প্রমোদনাথের অগাধ বিশ্বাস। অলকার মুখ থেকে সব কথা শুনে হীরেশকে দেখে তাঁর সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হল।

আর ভরা মনে দিনে দিনে তিলে তিলে হীরেশকে জানতে লাগল সুনন্দা।

সবে শীত পড়তে শুরু করেছে কলকাতায়। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। ধোঁয়া আর কুয়াশায় তাড়াতাড়ি বিকেলের আলো মিলিয়ে যায়।

হীরেশ কলকাতায় না থাকলে অলস দিন কাটে সুনন্দার। কোন কাজ থাকে না। কোথাও বেরুবার তাগিদ আসে না মন থেকে।

এম, এ, পডবার ইচ্ছে ছিল—সুযোগও ছিল। কিন্তু শেষ অবধি পড়া আর হয়ে উঠল না।

অলকাও উৎসাহ দিলেন না বেশি।

বললেন, আর কি দরকার অত পড়াশুনো করে? রোদ্দুরে ইউনিভার্সিটিতে দৌড়দৌড়ি করলে লালিত্য ঝরে যাবে শুধু।

তার চেয়ে সুনন্দা যদি চৌরঙ্গীর কোন ইস্কুল থেকে সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যেবেলা একঘণ্টা ক্লাশ করে ইংরেজি উচ্চারণ আর আদব-কায়দা ঝালিয়ে নেয় তাহলে ভবিষ্যতে তার নিজেব অনেক সুবিধা হবে।

কিন্তু মার কথায় দু একদিন ক্লাশ করে সুনন্দা দেখল সময় নষ্ট করা ছাড়া ওখানে গিয়ে আর কোন সুবিধা হবে না তার। তারা যা শেখায় তা সুনন্দা কেন, অতি সাধারণ বাড়ির ছোট মেয়েরাও জানে।

কাজেই সুনন্দার এখন প্রচুর অবসর।

হীরেশের একটা চিঠি এসেছে আজ। লিখেছে, এ মাসের শেষের দিকে কয়েকদিনের জন্যে সে কলকাতায় আসবে।

আরও লিখেছে, বোধহয় আগামী বৈশাখে সুনন্দাকেও তার সংগে দিল্লী গিয়ে বাস করতে হবে।

তারপর সরকার তাকে কোথায় বদলী করবে সে জানে না। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় ভারত সরকারের আপিসে তাকে যেতে হবে।

এসব কথা সুনন্দা জানে। তবু হীরেশ তাকে নতুন করে আবার জানায়।

সে যেন সমস্ত পৃথিবী তুলে ধরবে তার সামনে।

হীরেশের চিঠির উত্তর আজই লিখতে হবে। চাকরের ওপর সুনন্দা ভরসা করতে পারে না। নিজের হাতে ও হীরেশের চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে।

হীরেশকে যে চিঠি লিখবে তার ভাষা মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিল সুনন্দা।

এমন সময় অমিতা এসে একেবারে ওর পাশে বসে পড়ে বলল, বিয়ে অনেকেরই ঠিক হয় কিন্তু আজকের যুগে কেউ তোর মতো আত্মবিস্মৃত হয়ে জগৎ সংসার ভুলে যায় না—বন্ধুবান্ধবকে ছেঁটে দেয় না। তুই কি হয়েছিস বল তো?

সুনন্দা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, রোজ ভাবি তোদের ওখানে যাব, কিন্তু শরীরটা এত খারাপ যাচ্ছে কদিন থেকে—

চেহারা দেখে কিছু মনে হচ্ছে না কিন্তু। প্রেমে পড়বার সংগে সংগে মানুষ মিথ্যা কথাও বলতে শেখে নাকি?

মিথ্যা কথা নয় রে অমিতা! সত্যি বলছি—

থাক থাক, অমিতা হেসে বলল, কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই। যা বোঝবার আমি বুঝে নিয়েছি ঠিক। যাক গে, আজ আমি তোকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি—

সুনন্দা হেসে জিজ্ঞেস করল, বিয়ে করছিস বুঝি?

আমি তো আর তোর মতো নই যে দিনরাত ওই এক ভাবনা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আমরা কাজের লোক—বুঝেছিস?

তা বটে। নতুন রেকর্ড বেরোলো কিছু? হঠাৎ এত গান গাওয়া কমিয়ে দিলি কেন?

কমাব কেন? পুরোদমে দিনরাত গাইছি। তুই কিছু খবর রাখিসণ্না তাই বল?

কিন্তু রেডিওতে তোর গান তো আজকাল একেবারেই শুনি না—

ওসব জায়গায় গাইবার বেশি সময় পাই না রে। আমরা এখানে ওখানে জলসা করে আজকাল গান গাই।

সুনন্দা বলল, আমাকে তো কখনও খবর দিস না—

অমিতা হেসে বলল, যেন খবর দিলেই তুই যেতিস। আজ খবর দিতেই এসেছি। যদি না যাস তাহলে তোর সংগে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।

কি ব্যাপার বল না?

অনিল চৌধুরী আর দেবদত্ত আমাদের বাড়িতে আগামী শনিবার গান গাইবে। তোকে সন্ধ্যেবেলা যেতেই হবে।

নিশ্চয়ই যাব, সুনন্দা হাসল, অনিল চৌধুরী তোর জন্যেই ফেমাস হয়ে উঠল দেখছি। একেই বলে প্রেম।

বাজে কথা রাখ। তাহলে তুই ঠিক যাচ্ছিস?

নিশ্চয়ই।

তোরা না গেলে চলে না। আমরা এমনি করে প্রত্যেককে আমাদের গান শোনাতে চাই। বুঝিস তো অনেক অসুবিধার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়।

সুনন্দা বলল, তোর আবার অসুবিধা কি? জমিদার বাড়ির মেয়ে, সখ করে গান গেয়ে দিন কাটাচ্ছিস?

অমিতা বলল, সখ নয় রে। গান না গেয়ে থাকতে পারি না বলেই গান গাই।

কিন্তু শুধু গান গাইলেই চলবে? বিয়েটা করে ফেল এবার। অনিল চৌধুরীর সংগে তোর সম্পর্ক তো সকলেই জানে এখন।

অমিতা হাসল, শুধু আমি নিজেই জানি না। যাক, আমি আজ চললাম। তুই শনিবারে ঠিক যাস কিন্তু। আমাকে এখন অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

অমিতা চলে গেল।

চিরদিনই অমিতা ওই একরকম। শুধু গান আর গান। সুনন্দার সংগে যখন কলেজে পড়ত তখন থেকেই ভাল গান গায় বলে ওর বেশ নাম হয়ে যায়।

সুনন্দাদের বাড়িতে আগে প্রায়ই আসত অমিতা। অনেক গান গাইত। কিন্তু এখন ওর দেখা পাওয়া মুশকিল। আর কোন দিকে ওর মন নেই। মুখে শুধু এক কথা, গানের মোড় ফেরাতে হবে। গতানুগতিক গান আর গাইব না।

নতুন ইস্কুল খুলব।

নতুন গান গাইব।

মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে অমিতার।

অমিতার বাড়ি গিয়ে গান শোনবার খুব বেশি ইচ্ছে নেই সুনন্দার।

কয়েকদিনের মধ্যেই হীরেশ এসে পড়বে, তখন ওর সংগে কি কথা বলবে, কোথায় বেড়াতে যাবে, কেমন সাজ-পোশাক করবে—এইসব কথা একান্তে সুনন্দার ভাবতে ভাল লাগে।

ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না।

তবু একসময় আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। হালকা হলদে রঙের কোটের সংগে রঙ মিলিয়ে একটা শাড়ি টেনে বের করল।

ভাবল, কি হবে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি বসে থেকে। তার চেয়ে অমিতা, অনিল চৌধুরী আর দেবদত্তর গান শুনে কিছু সময় কাটিয়ে আসা যাক।

বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। বর্ধমান থেকে বাবা এসেছেন আজ। •একটু আগে কোন আত্মীয়র সংগে দেখা করতে মা আর বাবা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সুনন্দাকে ট্রামে যেতে হবে অমিতাদের বাড়ি।

খুব বেশি দূরে নয়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে ট্রাম নিলে মাত্র দুটো স্টপ। ল্যান্সডাউন এক্সটেনসনে নেমে একটু হেঁটে গেলেই চলবে।

অমিতাদের বাড়ি ল্যান্সডাউন ট্যারেসে।

সুনন্দা গেট খুলে বাইরে বার হল।

শনিবার। আজ বড়দিনের ছুটি। রাস্তায় বেশ ভিড়। শীতও পড়েছে খুব। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে কলকাতা শহরে। একদিন বেশ শীত, আর একদিন রীতিমতো গরম।

সুনন্দার পৌছতে একটু দেরি হয়ে যাবে। চারপাশ বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখল সুনন্দা। সাতটা বেজে গেছে। অমিতা হয়তো আরও আগে যেতে বলেছিল।

অমিতাদের বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করল সুনন্দা। গান চলছে তখন।

কার গলা? দেবদত্তর! অদ্ভুত ভাল লাগছে। এখন ভেতরে গিয়ে বাধা দিতে ইচ্ছে করছে না।

গান থামুক, তখন ঘরে ঢুকবে সুনন্দা।

চুপচাপ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ও।

এ গান কখনও আগে সুনন্দা শোনে নি। রেকর্ডে নয়, রেডিওতে নয়, ফিল্মে নয়।

কার লেখা গান গাইছে দেবদত্ত! সুর ভজনের কিন্তু কথা একেবারে অন্যরকম।

দুর্দিনে হাহাকারে ভেঙে পড়ছে না নিরাশ্রয় গায়ক।

আর পাঁচ জনের সংগে মিশে শক্তিমান হয়ে উঠতে চাইছে। পরিপূর্ণতার স্বাদ খুঁজে ফিরছে নিবিড় একতায়।

গান থামবার পর ঘরের মধ্যে এলো সুনন্দা। তার অনেক চেনা ছেলেমেয়ে এসেছে। বহু অচেনা লোকও রয়েছে।

অমিতার মা বসে আছেন এক কোনায়।

অমিতা কাছে এসে বসল, খুব সময় এসেছিস! আসর ভেঙে গেল যে—

একটু দেরি হয়ে গেল, সুনন্দা বলল, উনিই বুঝি তোদের দেবদত্ত?

হ্যাঁ। তোর সংগে আলাপ নেই?

না।

আয় আলাপ করিয়ে দি, সুনন্দাকে টেনে নিয়ে সাবধানে পথ করে অমিতা দেবদত্তর দিকে এগিয়ে গেল।

দেবুদা, আমার আর এক বন্ধু।

মৃদু হেসে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, কেমন শুনলেন?

খুব ভাল। কার লেখা এ গান?

অনিল চৌধুরীর, ওই যে। অনিলের সংগে ওঁর আলাপ করিয়ে দাও অমিতা।

অমিতা হেসে বলল, সুনন্দা অনিলকে চেনে।

গান শুনে যেমন মনে হয়েছিল, সুনন্দা তাকিয়ে দেখল, গায়কের চেহারা মোটেই তেমন নয়।

সে ভেবেছিল দেবদত্তর চেহারাও কণ্ঠস্বরের মতো গম্ভীর হবে।

কেন ভেবেছিল কে জানে!

কিন্তু দেবদত্তর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ নেই। শুধু বেদনার একটা করুণ ছায়া ফুটে উঠেছে।

এক দৃষ্টিতে দেবদত্তও তাকিয়ে আছে সুনন্দার দিকে। লজ্জা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল।

অমিতা বলল, দেবুদা আর একটা ধর।

হেসে বলল, অনেক হয়েছে। আজ আর নয়।

কিন্তু সুনন্দা যে একটা গানও পুরো শুনতে পেল না। বেচারির আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে—

একটু নয়, বেশ, সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে দেবদত্ত বলল, কাজেই আজ আর আপনার গান শোনা হল না—

সুনন্দা হেসে জিজ্ঞেস করল, কবে শোনবার সৌভাগ্য হবে বলুন?

দেবদত্ত হালকা সুরে বলল, যেদিন আপনি আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করবেন।

সত্যি যাবেন?

কেন যাব না?

যদি কাল আসতে বলি?

অমিতা রাজি?

অমিতা কি ভেবে বলল, কাল রবিবার। অনিলের বাবার অসুখ। ও তো ডাক্তারের কাছে যাবে—

দেবদত্ত সুনন্দাকে বলল, আমিই বরং আপনাকে একটা দিন ঠিক করে জানাব?

আমার ঠিকানা জানেন?

অমিতা তো জানে। তবু আপনি বলুন?

বাড়ির নম্বর দিয়ে সুনন্দা বলল, টেলিফোন নম্বরটাও লিখে রাখুন। ঠিক জানাবেন কিন্তু।

দেবদত্ত হাসল, আপনিও তো গাইতে পারেন, না?

একেবারেই না—

কিন্তু আপনার গলা গানের। আমার মনে হয় চেষ্টা করলেই আপনি ভাল গাইতে পারবেন।

সুনন্দা দেবদত্তর কথার কোন উত্তর দিল না।

প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন অন্নপূর্ণা। অমিতার সংগে তিনি পরিবেশন করতে শুরু করলেন।

প্রত্যেকবারই এমন হয়।

যতবার অমিতার বাড়িতে গানের জলসা হয়, খাওয়া-দাওয়ার বিরাট ব্যবস্থা করেন তিনি।

ওদিকে অনিলের সংগে কার তর্ক বেধে গিয়েছিল। অনিলের স্বভাব এমনি। একটুতেই সে রেগে যায়।

দেবদত্ত অনেক বুঝিয়েছে তাকে।

কতবার বলেছে, কারুর যদি তোর গান ভাল না লাগে তাহলে তুই কিছুতেই তাকে তর্ক করে ভাল লাগাতে পারবি না। সে-চেষ্টাও করবি না। চুপ করে থাকবি। কেন তার ভাল লাগল না ভাববি। ভবিষ্যতে যেন ভাল লাগে তার জন্যে আরও দরদ দিয়ে গান গাইবি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ভদ্রলোক বললেন, অনেক চেষ্টা করলাম তো। কিন্তু মনে ধরতে পারলাম না। এ সব গানকে আমি ঠিক গান বলে মনে করতে পারি না।

অনিল জিজ্ঞেস করল, কেন বলুন তো? অথচ অনেকেই গান বলে মনে করেন। এই তো এত লোক রয়েছে এখানে। সকলেরই তো আমাদের গান ভাল লেগেছে—

তা হয়তো লেগেছে—

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে অনিল বলল, আপনারা ধরে নেন, গান

চিরকাল এক রকম থাকবে। কাব্যে সাহিত্যে এমন কি, শিল্পেও আজ পরিবর্তন এসেছে। কোন কিছুই আজ কোনরকম বিলাস নয়, সব কিছু কোন না কোনভাবে সমাজের কাজে লাগছে। গান শুধু তার পুরানো রূপ নিয়ে পিছনে পড়ে থাকবে কেন?

ভদ্রলোক একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, কে বলল আপনাকে গান পিছনে পড়ে আছে? মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখ তুচ্ছ অনুভূতি অপূর্ব সুরে ধরে রবীন্দ্রনাথ কি সংগীতের বিরাট পরিবর্তন আনেন নি?

নিশ্চয়ই, অনিলও জোর গলায় বলল, কাব্যেও তো তিনি বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। তবু আধুনিক কবিরা কি আরও অগ্রসর হবার চেষ্টা করছেন না?

কাব্য নিয়ে আপনার সংগে আমি তর্ক করতে পারব না। আমি শুধু বলতে চাই আপনাদের গলা আছে, সুরও দিতে পারেন ভাল, তবু আপনাদের গান আমার প্রবন্ধের মতো মনে হয়েছে—

অনিল ভদ্রলোকের কথার উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দেবদত্ত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের গান যদি আপনার ভাল না লাগে তাহলে দোষ আমাদের, আপনার নয়।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেবদত্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দেবদত্ত বলল, আমরা সবে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেছি। চিরদিন গান শোকে মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছে, বেদনায় শান্তি দিয়েছে। অনাচারের যুগে ভক্তির প্লাবন বইয়েছে। ভগবানকে প্রতিমুহূর্তের সংগী করেছে।

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক কথা।

দেবদত্ত বলে চলল, আজও ঠিক তেমনি করেই গান তার কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস, কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে সে বলল, সভ্যতার রূপ পাল্টাবার সংগে সংগে মানুষের অনেক নতুন সমস্যাও

দেখা দিয়েছে। তাই আমরা গানের মধ্যে দিয়ে সেগুলি আর পাঁচ জনের হৃদয়ে পৌছে দিতে চাই—

বেশ তো দিন না! কে আপত্তি করছে মশাই! কিন্তু আপনার তো তা করতে পারছেন না—

না, পারছি না, দেবদত্ত বলল, কারণ আমরা বুদ্ধি দিয়ে যা ধরতে পেরেছি, হৃদয় দিয়ে তা ধরতে পারছি না বলে আপনার মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছি না।

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না।

দেবদত্ত বলল, তা ছাড়া কাব্যে বলুন, শিল্পে বলুন—প্রথম যারা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করে তাদের অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। লোকে যুগ যুগ ধরে যেমন শুনে আসছে তেমন না শুনতে পেলে রস গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বললেন, তা তো ঠিক। আমি তো এঁকে সেই কথা বলতে চেয়েছিলাম।

দেবদত্ত হেসে বলল, আমাদের গান আপনার মতো আর পাঁচজন লোকের হৃদয়ে যতদিন না পৌছবে ততদিন আমরা এক পাও সামনে এগিয়ে যেতে পারব না—

আস্তে আস্তে আসর ভেঙে যেতে লাগল।

রাত হয়ে যাচ্ছে তাই দেবদত্তকে আর একবার ফোন করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সুনন্দাও চলে গেল।

অমিতার এক বন্ধু নীলা, যার বিয়েতে কিছুদিন আগে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে দেবদত্ত, লোক কমে গেছে দেখে তার কাছে এসে বসল।

বোধ হয় কিছু বলতে চায়।

অমিতা অনিলকে বলল, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারে। অমন চড়া সুরে লোকের সংগে কথা বলতে হয়?

অনিল বলল, উনিই বা ওরকম করে কথা বলবেন কেন? কি এমন উঁচুদরের শ্রোতা এলেন উনি?

দেবদত্ত বলল. উঁচুদরের শ্রোতার শোনবার মতো গানের অভাব নেই ভারতবর্ষে। তোর গান উঁচুদরের শ্রোতাদের জন্যে নয় সেকথা ভুলে যাস কেন?

ভুলব কেন? ভুলি না বলেই তো ওই ধরনের কথা যারা বলে তাদের সহ্য করতে পারি না।

একটু বিরক্ত হয়ে দেবদত্ত বলল, তোর মনে রাখা উচিত, গান যে-কোন মানুষকে সব যুক্তি-তর্ক ভুলিয়ে অন্য জগতে নিয়ে যায়। তা যদি না করতে পারিস তাহলে বুঝতে পাবিস না, ব্যর্থ তোর গান?

অনিল বলল, তুমি অন্যরকম কথা বলছ দেবুদা। গান এতদিন সব ভুলিয়ে এসেছে কিন্তু এখন সব মনে করিয়ে দেবে। মানুষকে সমাজ-সচেতন করে দেবে। ত যদি না করতে পারে তাহলে মদ খেয়ে মাতাল হওয়া যা, গান শুনে সব ভুলে বিভোর হওয়াও তা—

দেবদত্ত বলল, কিন্তু সব চেয়ে বড কথা হল মানুষের মনের সংগে গানের যোগ। তা যদি না করতে পারিস, লোকে বিভোর হবে না, সমাজ-সচেতনও হবে না। হাসবে, বিদ্রূপ করবে, রেগে যাবে।

এমন শ্রোতাদের শোনালে তাই ফল হবে বৈকি। এরা যে আমাদের গানের কোন মূল্য দেবে না সে তো জানা কথাই—

তুই কি করতে চাস অনিল?

যাদের জন্যে আমাদের গান তাদের শোনাতে চাই। সাজান ঘরে জলসা না করে খোলা মাঠে আসর করতে চাই। দেখ আমাদের গান লোকের ভাল লাগে কিনা।

দেবদত্ত বলল, আমি তো কবে থেকে সেকথা বলে আসছি। লোকের সংগে তর্ক না করে এবার সে-ব্যবস্থা করে ফেল।

অমিতা বলল, আমার এক বন্ধুর সংগে আমি কথা বলে রেখেছি দেবুদা। কয়েকদিনের মধ্যে ব্যবস্থা পাকা করে আমি তোমাদের জানাব।

ঠিক আছে।

এদের থেমে যেতে দেখে নীলা আস্তে আস্তে বলল, একদিন আমাদের বাড়িতে এস দেবুদা।

নিশ্চয়ই যাব। কবে এলে নীলা?

দু-চার দিন হল।

ক-দিন থাকবে কলকাতায়?

মাস খানেক।

দেবদত্ত হেসে বলল, অনেক সময়। এর মধ্যে একদিন যাব বৈকি তোমাদের ওখানে।

নীলা ম্লানস্বরে বলল, তোমার সংগে অনেক কথা আছে। কলকাতায় আসবার পর থেকে তোমার সংগে দেখা করবার কথা ভাবছিলাম।

দরকারী কথা? এখুনি বলবে?

না, না, সভয়ে চারপাশে তাকিয়ে নীলা বলল, যেদিন আমাদের বাড়িতে যাবে সেদিন বলব।

দেবদত্ত ঠিক বুঝতে পারল না তাকে কি কথা বলতে চায় নীলা! তার ভাব-ভঙ্গি একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে যেন। ভাবল, যদি সুযোগ হয় অন্য সময় জেনে নেবে কি ব্যাপার!

বিয়ের আগে এদের সংগে নীলাও গান গাইত। আধুনিক গান—বিশেষ করে রবীন্দ্র-সংগীত, আশ্চর্য ভাল গাইতে পারত। কলেজে পড়বার সময় দু-তিনটে রেকর্ড বেরিয়ে বেশ নাম হয়েছিল তার।

হঠাৎ একদিন দেবদত্ত নীলার বিয়ের চিঠি পেল। সম্রান্ত বংশের

ভাল চাকুরে ছেলের সংগে বিয়ে হবে তার। বিয়ের পর নীলা বরের সংগে কলকাতার বাইরে চলে যাবে। তার শ্বশুর বাড়ি বাংলার বাইরে।

তারপর আজ প্রথম দেখা।

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে গান গাইছ না ওসব ছেড়ে দিয়েছ নীলা?

ছাড়তে আর পারলাম কই দেবুদা? তবে যেখানে থাকি সেখানে গান গাইবার অনেক অসুবিধা।

অনেকদিন তোমার গান শুনি নি। এখন একটা গাইবে?

আজ নয়। রাত হয়ে গেল। এবার যাই। কবে আসবে বল? সেদিন গান শোনাব। তোমরা সবাই যেও। অমিতা অনিলকেও বলেছি।

বেশ বেশ, একটা দিন ঠিক করে অমিতাকে বলো আমাকেও সংগে করে নিয়ে যাবে।

আগামী সপ্তাহে জানাব কিন্তু।

দেবদত্ত হাসল, যেদিন তোমার সুবিধা হবে।

আর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই উঠে দাঁড়িয়ে দেবদত্ত বলল, অমিতা আমিও চললাম।

চল দেবুদা, তোমাকে ট্রাম-রাস্তা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি। এতক্ষণ ঘরে বসে থেকে মাথা ধরে গেছে।

জোরে হেসে দেবদত্ত বলল, তাহলে বুঝতে পারছ কেমন গান গাইছি আমরা? শুনতে শুনতে নিজেদেরই মাথা ধরে যায়?

অমিতাও হেসে বলল, গান শুনে মোটেও মাথা ধরে নি আমার। মাথা ধরেছে অনিলের তর্ক শুনে।

একসংগে ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোড ধরে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে গেল।

থমথমে রাত। কনকনে হাওয়া বইছে। ঠুং ঠুং করে খুব জোরে একটা রিক্স চলে গেল। মোটরের হর্ন বাজছে মাঝে মাঝে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে।

দেবদত্তকে ট্রামে তুলে অনিল বলল, আমি এবার যাই অমিতা।

এত তাড়া কিসের? যতীন দাস রোড অনেক দূর বুঝি?

অনিল হাসল, কি করতে হবে বল?

আমাদের বাড়ি গিয়ে আর এক কাপ গরম কফি খেতে হবে।

খুব ভাল কথা। চল।

রাস্তা চলতে চলতে দু-এক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। কিন্তু এর মধ্যেই মাথা ধরা ছেড়েছে অমিতার।

সে অনিলের কথাই ভাবছিল।

সরোজ বাবু বোধ হয় আর বাঁচবেন না। তবু অমিতা ভাবে, কর্কট রোগে তেমন করে চিকিৎসা করতে পারলে কেউ কেউ নাকি বেঁচেও যায়।

কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা কোথায় অনিলের! একমাত্র ছেলে হলেও কর্কট রোগের সংগে লড়বার সাধ্য তার নেই।

অমিতা জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার কি কোন আশা দিয়েছে অনিল? উনি আজ কেমন আছেন?

সেই একরকম, একটু থেমে অনিল বলল, বাড়িতে আর বেশিদিন রাখা যাবে না। শিগগিরই খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বাবার। পেটে টিউব লাগিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসপাতালে পাঠাবার কি করলে?

কথাবার্তা বলেছি। আসছে সপ্তাহে পাঠাতেই হবে। কিন্তু হাসপাতালের কথা বললেই উনি বড় কান্নাকাটি করেন। বলেন, একবার গেলে আর আমার বাড়ি ফিরে আসা হবে না।

অমিতা বলল, অসুখে অমন হয় মানুষের, কি ভেবে সে জিজ্ঞেস করল, অপারেশনের কি হল?

অনিল বলল, ডাক্তার স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না। বাঁচতেও পারেন আবার মরে যেতেও পারেন। হার্ট আর লাং-এর মাঝখানে কি-না—খুব বড় রকমের অপারেশন।

অপারেশন করে ফেললেই তো হয়।

তা তো হয়, অনিল ম্লান হেসে বলল, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। আর তা ছাড়া অনেক টাকার ব্যাপার। অত টাকা কোথায় পাব আমি?

কত টাকা লাগবে?

তা প্রায় হাজার দু-এক।

অমিতা বলল, তার ব্যবস্থা না হয় করা যেতে পারে। সেটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

অনিল বলল, খুব শক্ত ব্যাপার অমিতা। তোমাকে টাকার কথা ভাবতে হয় না বলে তুমি একথা বলতে পারছ। দু হাজার টাকা জোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আপিস থেকে পাবে না?

কদিন চাকরি করছি? কেরানির প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এর মধ্যে দু হাজার টাকা জমবার কথা নয়।

কিন্তু অপারেশন করতেই হবে, জোর গলায় অমিতা বলল, এমন তিল তিল করে ওঁকে মরতে দেওয়া যেতে পারে না।

অপারেশন করলে বেঁচেও তো যেতে পারেন, কি ভেবে অমিতা বলল, আর ওঁকে রাজি করাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

অনিল হেসে বলল, তা না হয় থাকলাম। কিন্তু টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব সে কথা তো ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

অমিতা অসঙ্কোচে বলল, আমি দেব টাকা।

তুমি? তুমি কেন দেবে?

অমিতা সহজ স্বরে বলল, কেন? আমার দু হাজার টাকা নেই নাকি ভাবছ?

তা থাকবে না কেন! আরও অনেক বেশি আছে তোমার। কিন্তু তোমার টাকা নেব কেমন করে?

ধার হিসেবে আমার কাছ থেকে টাকা নিলে ক্ষতি কি অনিল?

সে-ধার শোধ করবার কথা কে ভাববে?

না হয় না-ই ভাবলে। আজও এত দম্ভ কেন তোমার? আমার কাছে কি তোমার আর কোন ঋণ নেই?

অনিল উত্তর দিল না।

অমিতা মনে মনে কি ভেবে দু-এক মিনিট পর বলল, আমার বাবার যদি অসুখ হত আর আমার দরকারে তুমি টাকা দিতে চাইতে তাহলে আমাদের সম্পর্কের কথা ভেবে তা নিতে আমার একটুও বাধত না—

বাধা দিয়ে অনিল বলল, কিন্তু মিতা, তুমি মেয়ে। তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে আমার একটু সঙ্কোচ হবে বৈকি!

মিথ্যে দম্ভ বজায় রেখে তুমি তোমার বাবাকে মারতে চাও অনিল?

দম্ভের কথা নয়—

তা ছাড়া আবার কি? তুমি ভাবছ টাকা নিলে তুমি আমার কাছে ছোট হয়ে যাবে, অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতা বলল, আমার কাছ থেকে যদি তুমি টাকা না নাও, আর তোমার বাবার অপারেশন না করা হয় এবং যদি শেষ অবধি তাঁর খারাপ একটা কিছু হয়, তাহলে তুমি কি মনে কর তোমাকে আমার খুব বড় বলে মনে হবে?

অনিল বলল, অত কথা আমি ভাবছি না মিতা। শুধু ভাবছি তুমি তো আমাকে অনেক দিয়েছ, আর কত দেবে?

বাজে কথা রাখ, অমিতা জোর গলায় বলল, আর কোথাও থেকে যদি দু-এক দিনের মধ্যে জোগাড় করতে না পার তাহলে আমার কাছ থেকে তোমাকে টাকা নিতেই হবে। আমি আজই মাকে বলে রাখব।

অনিল হঠাৎ হেসে উঠল, টাকা নেবার জন্যে সাধাসাধি করে এমন মেয়ে পৃথিবীতে বোধহয় আর একটিও নেই।

না। তাই বাজে দম্ভ মাথায় তুলে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাব—বুঝলে?

অমিতার একটা হাত জোরে চেপে ধরল অনিল, বুঝলাম!

আঃ কি কর, বাড়ি এসে গেছে দেখছ না? আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল অমিতা।

তারপর গেট খুলল।

এ বাড়ির কেউ অমিতার কোন কাজে কখনও বাধা দেয় না। বাড়িতে মানুষ অবশ্য খুব কম।

রাজমোহন আর অন্নপূর্ণা।

শুধু অমিতার বেলায় কেন, কোন ব্যাপারেই রাজমোহন বাবু আর

থাকেন না। তাঁর মাথাটা ঠিক আছে কি না সন্দেহ। ওপরে নিজের ঘরে দুই হাতে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে থাকেন তিনি। কখনও কখনও আপন মনে বিড় বিড় করে কি বকেন। অমিতাকে কাছে ডেকে তার মাথায় হাত বুলোন।

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে খুব সাবধানে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, খবরদার বিয়ে করবি না। এ বাড়িতে যেমন আছিস তেমন থাকবি চিরকাল—

অমিতা ভয়ে ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাই থাকব বাবা!

হঠাৎ হেসে ওঠেন রাজমোহন বাবু, কিছু ভাবতে হবে না তোকে। জমিদারি গেছে তো কি হয়েছে? কলকাতায় তিন-তিনটে বাড়ি আমার। সব তোর নামে লিখে দিয়েছি, একটু থেমে কঠিন দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলেন, কিন্তু বিয়ে করলে একটি পয়সাও পাবি না বলে দিলাম—

অমিতা মৃদুস্বরে বলে, না বাবা, আমি কখনও বিয়ে করব না। যেমন আছি তেমন থাকব।

মেয়ের পিঠ চাপড়ে রাজমোহন বলেন, ঠিক আছে।

বড় মেয়ে শান্তার মৃত্যুর পর রাজমোহন এমন হয়ে গেছেন। কোথাও যান না। কারুর সংগে মেশেন না। অনেক চেষ্টা করেও অমিতা একদিনও গানের জলসায় তাঁকে টেনে আনতে পারে নি।

অপরাধীর মতো রাজমোহন আত্মগোপন করে থাকতে চান। শুধু মাঝে মাঝে অমিতাকে কাছে ডেকে উপদেশ দেন।

দিদির কথা ভাল মনে পড়ে না অমিতার। শান্তা যখন মারা যায় তখন তার বয়স খুব কম। বদ্ধ পাগল অবস্থায় রাঁচির হাসপাতালে বড় কষ্ট পেয়ে মরেছে শান্তা।

সারাদিন মুখ লাল করে চোখ বড় করে শুধু চিৎকার করেছে, না-না-না, কিছুতেই আমি বিয়ে করব না। যাও, বেরোও সব! যে আমার বিয়ে দিতে চাইবে এই ইট দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেব—

শান্তা নিচু হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে ইট খুঁজত বোধহয়। শুকনো চোখে রাঁচির হাসপাতালে সে-দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যেত না। আজও সেকথা ভাবতে কষ্ট হয়।

তবু প্রায়ই অন্নপূর্ণা অমিতাকে শান্তার কথা বলেন। আর তাকে লুকিয়ে চোখ মোছেন।

ঠিক বয়সে শান্তার বিয়ে দিয়েছিলেন রাজমোহন বাবু।

তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। জমিদারির আয় ছিল প্রচুর। আর রাজমোহন বাবুর মেজাজ ছিল চড়া। সাধারণ লোককে মানুষ বলে গণ্য করতে বেশ বিলম্ব হত তাঁর। বংশ-গৌরবের দম্ভে তিনি দিশা হারাতেন।

অমিতার দিদি নাকি খুব সুন্দর দেখতে ছিল। আশ্চর্য রকম শান্ত স্বভাব ছিল বলে বাপ-মা তার নাম দিয়েছিলেন শান্তা। শান্তার ষোল বছর বয়সে রাজমোহন বাবু তার বিয়ে দেন।

বিয়ের সময় ঘটা হয়েছিল বটে!

নামকরা জমিদার বাড়িতে প্রথম কাজ। ঘটা তো হবেই। সেদিন যারা নেমন্তন্ন পেয়েছিল, আজও নাকি মনে আছে তাদের সেকথা।

যার সংগে সম্বন্ধ হয়েছিল সে-ও তেমন আর এক জমিদার বাড়ির ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে। শিকারী বলে তার খুব নাম। রাজমোহন বাবু তাদের বাড়িতে গিয়ে মাউন্ট করা অনেক বাঘ দেখে এসেছিলেন।

কিন্তু হলে হবে কি, বিয়ের কিছুদিন পর বাপের বাড়িতে ফিরে এল শান্তা।

এর মধ্যেই একটু বেশি মাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেছে যেন। থমথমে মুখ করে এক ধারে বসে থাকে। কারুর সংগে বেশি কথা বলতে চায় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে ম্লান হেসে বলে, কি জানি কেন, বাপের বাড়ি এসে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মার কাছে বেশিদিন আসল ব্যাপার কেমন করে চেপে রাখবে মেয়ে!

একদিন সব বেরিয়ে পড়ল।

সাহেব মহলে শান্তার স্বামী দুর্গাদাসের খুব নাম। সদল বলে প্রায়ই সে শীকারে বেরিয়ে পড়ে। ফিরে আসে তিন-চারদিন পর।

একবার ক্ষত-বিক্ষত দেহে ফিরে এল দুর্গাদাস।

কি ব্যাপার?

না, বাঘে জখম করেছে।

আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

কোন নেপালী মেয়েকে নিয়ে বিশ্রী কাণ্ড করে দুর্গাদাস। যথাসময় নেপালীরা শিক্ষা দিয়েছে তাকে।

তাকে ভুলিয়ে তারা কোন এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাকে প্রহার করে।

ভোজালি দেখিয়ে বলে, সেই নেপালী মেয়েকে বিয়ে না করলে গলা কাটা যাবে তার। ভয়ে ভয়ে দুর্গদাসকে বিয়ে করতে হয়। তারপর সেই নেপালী মেয়েকে খুন করে পালিয়ে আসে দুর্গাদাস। কেমন করে লাস গুম করে সেকথা কেউ জানে না। এমন আরও অনেক কাহিনী শোনে শান্তা।

আরও অনেক রহস্যের সন্ধান পায়।

তবু সে তেমন বিচলিত হয় না।

ভাবে, নতুন বউ হয়ে এসেছে তাই এখন মুখ খোলা শোভা পায়

না। আর একটু পুরোনো হলে, এ বাড়ির হালচাল বুঝে নিয়ম-কানুন মেনে নিতে পারলে স্বামীকে সংশোধন করে নেবে আস্তে আস্তে।

এ আর নতুন কথা কি।

বনেদী ঘরে এমন ব্যাপার কত ঘটে।

কিন্তু শান্তার স্বভাব মানিয়ে নেয়া, সংশোধন করা নয়।

মানিয়ে সে নিতে পারল না।

সংশোধন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল।

স্বামীর সংগে থেকে শুধু সংক্রামক রোগ এলো তার দেহে।

সারা দিনরাত বিকট যন্ত্রণা অনুভব করে সে। বেশি কথা বলা তার স্বভাব নয়।

তাই প্রতিবাদের ভাষা জোগায় না মুখে।

বাপের বাড়িতে এসব কথা সবিস্তারে হয় তো শান্তা কোনদিনও বলত না। নেহাৎ প্রয়োজন হলে মাকে সামান্য ইংগিত দিলেই কাজ চুকে যেত।

কিন্তু একদিন কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কোথা থেকে মত্ত অবস্থায় দুর্গাদাস এসে হাজির।

বলে, মেয়েকে নাকি তার নামে লাগিয়ে বাপ-মা জোর করে আটক করে রেখেছে। এখুনি শান্তাকে সংগে করে নিয়ে যাবে দুর্গাদাস। না নিয়ে যেতে দিলে যাকে হাতের সামনে পাবে তাকেই গুলি করবে।

বন্দুক নিয়ে এসেছে সে। নিচে গাড়িতে গুলি ভরা বন্দুক আছে।

বাড়িসুদ্ধ লোকের সামনে জামাইয়ের কাণ্ড দেখে অন্নপূর্ণা আর রাজমোহন বাবুর তো চক্ষু স্থির।

আর শান্তা যেন সেই মুহূর্তে মরে যেতে পারলে বেঁচে যায়।

প্রথমে হঠাৎ কেউ স্থির করতে পারল না কেমন করে সব ব্যাপারটা হালকা করে দেবে।

কিন্তু সব ভুলে ধীর পদক্ষেপে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্বরে শান্তা বলল, এঁরা কেউ আমাকে আটক করে রাঁখেন নি। কেন তুমি এখানে এসে শুধু শুধু মাতলামি করছ?

চিৎকার করে দুর্গাদাস বলল, তুমি যাবে কিনা?

হ্যাঁ যাব।

আর কাউকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে শান্তা খুব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

সে পালাচ্ছে মনে করে দুর্গাদাসও ছুটল তার পেছনে পেছনে।

মোটরের শব্দ শোনা গেল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পর একদিন দুর্গাদাসের বাবা দ্বিজদাস নিজের ইচ্ছেয় শান্তাকে বরাবরের জন্যে এ বাড়িতে রেখে গেলেন।

বললেন, তাঁদের মতো ভদ্রলোকের কাছ থেকে তিনি এমন অসাধু কাজ আশা করেন নি।

শান্তার নাকি মাথা খারাপ। তাঁরা সেকথা গোপন করে দুর্গাদাসের সংগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

কাজেই নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁদের মেয়েকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

শান্তার দিকে আর কেউ তাকাতে পারে না।

কী সাংঘাতিক পরিবর্তন!

রাঁচিতে চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা করা হল।

তারপর একদিন বিয়ের জের মিটল।

শান্তা মরল। কিন্তু ঘটকের আনাগোনা বন্ধ হল এ বাড়িতে। রাজমোহন বাবুকে যেন অমিতার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে না।

তাঁর যেন আর কোন দায় নেই।

করুক অমিতা যা খুশি। গান গেয়ে দিন কাটাক। ডিঙিরিকে বিয়ে করুক।

কিন্তু সুখী হোক।

একটি কথাও বলবেন না রাজমোহন বাবু।

দুপুরের দিকে কি একটা আলোচনার ব্যাপারে রেডিও স্টেশন যেতে হয়েছিল দেবদত্তকে।

কাজ সেরে বেরুতে বেলা হয়ে গেল বেশ। ভাবল, এখন বাড়ি ফিরে না গিয়ে অমিতাদের বাড়ি যাওয়া যাক।

এর মধ্যে ওরা নতুন জলসার ব্যবস্থা করতে পেরেছে কি না কে জানে।

ডালহৌসী স্কোয়ারে ট্রাম লাইনের ধারে এসে দেবদত্তর হঠাৎ সুনন্দার কথা মনে হল। ওকে বলেছিল কবে ওদের বাড়ি যাবে সেকথা পরে জানাবে।

একটু তাড়াতাড়ি না করলে ব্যাপারটা জুড়িয়ে যাবে।

যদিও আজকাল ছোট খাট ব্যাপারে কথা ঠিক রাখা সম্ভব নয়, তবু সাধ্য মতো কথা রাখবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি।

সেই জলসার পর থেকে সুনন্দার কথা বার বার মনে পড়ে যায় দেবদত্তর।

রাস্তার ওপারে একটা দোকান। লেখা রয়েছে, সেখান থেকে টেলিফোন করা যায়।

কাজটা সেরেই ফেলা যাক।

নিজের ডাইরিতে সুনন্দার নম্বর দেখে রাস্তা পেরিয়ে সেই দোকানে এসে দেবদত্ত টেলিফোন করল।

অন্য কোন ভদ্রলোক টেলিফোন ধরলেন, কাকে চান?

সুনন্দা আছে?

কে কথা বলছেন ?

বলুন দেবদত্ত।

ভদ্রলোক নাম শুনে একটু অবাক হয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন, দেবদত্ত। আচ্ছা ধরুন।

প্রায় সংগে সংগেই সুনন্দার গলা পাওয়া গেল, কেমন আছেন ? কবে আসছেন বলুন ?

চিনতে পেরেছেন দেখছি।

কি যে বলেন ! আমি তো আরও আগে আপনার কাছ থেকে খবর পাব আশা করেছিলাম।

দেবদত্ত বলল, দিনটা ঠিক করতে পারছিলাম না বলে দেরি হল—

কবে ঠিক করলেন ?

আগামী শুক্রবার—পরশু।

ধন্যবাদ। অমিতাকে বলেছেন ?

না। আমি এখুনি যাচ্ছি ওদের ওখানে। আপনি আসবেন ?

আমি ? একটু ইতস্তত করে সুনন্দা বলল, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে আজ—আচ্ছা ঠিক আছে। আমি সাড়ে ছটা পর্যন্ত থাকতে পারি।

দেবদত্ত বলল, ঘাবড়াবেন না। আজ গানের ব্যাপার নেই। কাজেই আপনার ফিরতে দেরি হবে না।

সুনন্দা হাসল, গান শুনতে হলে ঘাবড়াব কেন ? আজ একটা কাজ আছে বলেই একটু তাড়াতাড়ি চলে আসব—

অমিতাদের বাড়িতেও তাড়াতাড়ি চলে আসুন তাহলে।

আমি এখুনি যাচ্ছি।

দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রাম থেকে নেমে একটা দোকান থেকে দেবদত্ত জীবনে প্রথমবার নিজেই নিজের দুটো রেকর্ড কিনল। তারপর হন হন করে পা চালিয়ে সোজা অমিতাদের বাড়ি চলে এলো।

কিন্তু সুনন্দা তার আগে পৌছে গেছে।

তাকে নমস্কার করে দেবদত্ত বলল, আপনাকে শুধু শুধু টেনে এনে কষ্ট দিলাম—

না না, কষ্ট আর কি। অমিতা তো এখন পাবলিক ফিগার। সাধ্যসাধনা না করলে দেখা পাওয়া যায় না। এই সুযোগে ওর সংগে দেখা হয়ে গেল।

অমিতা বলল, তুমি আসতে বলেছ? তাই বল। আমি তো ওকে দেখে অবাক। এ ধার মাড়াবার মেয়ে সুনন্দা নয়।

এলে তোর দেখা পাওয়া যায় না তো কি করব?

দেখা পাওয়া যায় না মানে? কবে এসেছিস শুনি?

থাক থাক, দেবদত্ত হেসে বলল, আমার অনুরোধে উনি যখন এসেছেন তখন আজ আর ওঁর সংগে ঝগড়া না-ই করলে অমিতা, কাগজের মোড়ক খুলে সে সুনন্দার দিকে দুটো রেকর্ড বাড়িয়ে দিল, সেদিন কষ্ট করে এসেছিলেন, কিন্তু আপনাকে গান শোনাতে পারি নি। তাই আমার এই দুটো রেকর্ড—

অনেক ধন্যবাদ, সুনন্দা রেকর্ড দুটো নিয়ে গানের কথা পড়ে বলল, কোনটাই আগে শুনি নি, আজই বাড়ি ফিরে শুনব।

অমিতা বলল, চাও তো এখুনি শুনিয়ে দিতে পারি।

না না, দেবদত্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ গান-টান নয়। আপনার তাড়া আছে—

এমন কিছু তাড়া নেই। আর গান শোনালে অন্য কাজ আমি বাদ দিতে পারি।

আজ নয়। পরশু তো যাচ্ছি আপনার ওখানে। অমিতা মনে রেখ শুক্রবার এঁর বাড়িতে যেতে হবে।

শুক্রবার? অমিতা হেসে বলল, ওর ওখানে যাবার জন্যে বছরের শেষ দিন ঠিক করলে দেবুদা?

বছরের শেষ দিন নাকি? আরে তাই তো। সেদিন ৩১শে ডিসেম্বর। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

না না, হবে আবার কি? এমনি মনে হল তাই বললাম।

সুনন্দা বলল, ভালই তো। বর্ষ বিদায়ের উৎসব আমার বাড়িতেই হবে।

দেবদত্ত হেসে বলল, তাহলে নতুন বছরও আমাদের খুব ভাল কাটবে বোধ হয়।

খাইয়ে দেবেন তো আমাকে?

তা আর বলতে।

সুনন্দার কাজ থাকলেও গল্প ছেড়ে ঠিক সময় তার ওঠা হল না। প্রায় আটটা বাজল দেখতে দেখতে।

সুনন্দা যে সময়ের কথা ভুলে গিয়েছিল তা নয়। সাড়ে ছটা বাজবার আগে বারবার দেবদত্ত তাকে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

তবু উঠে দাঁড়িয়ে সুনন্দা বলল, আপনারা সকলে মিলে আমার কাজ পণ্ড করে দিলেন তো?

বেশ করলাম, অমিতা বলল, এবার থেকে আমাদের প্রত্যেক জলসায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবি।

গানের কি বুঝি আমি?

দেবদত্ত বলল, শুধু গানের নয়, যারা নিজেদের ভাল মন্দও বোঝে না আমরা কিন্তু সবচেয়ে আগে তাদের শোনাবার জন্যে গান গাই।

সুনন্দা হেসে বলল, নিজের ভাল মন্দ বুঝি না মানে? আমাকে কি বোকা ভেবেছেন আপনি?

কি যে বলেন! আপনি গান বুঝবেন না কেন? আপনার গলা এত ভাল যে আমি তো সেদিন ধরে নিয়েছিলাম আপনি গাইতে পারেন।

কই আর? কিন্তু আর দেরি নয়, আমাকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। মা ভীষণ ভাববেন।

আমিও উঠি অমিতা। অনিল আজ আসে নি?

সকালে এসেছিল। এ বেলা আসতে পারবে না ওর বাবাকে ছেড়ে।

কবে হাসপাতালে যাবেন উনি?

যত শিগগির হয়। খুব চেষ্টা করা হচ্ছে।

যদি সম্ভব হয় এঁদের বাড়িতে অনিলকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর।

নিশ্চয়ই।

সুনন্দা আর দেবদত্ত রাস্তায় নামল।

খুব আস্তে আস্তে হেঁটে গল্প করতে করতে ওরা দুজন ট্রাম লাইনের ধারে এসে দাঁড়াল।

জোরে উত্তরের হাওয়া বইছে।

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, একা যেতে পারবেন না আমি সংগে যাব?

না না, কিছু দরকার নেই। একাই তো রোজ ফিরি।

পরশু আবার দেখা হবে।

ঠিক আসবেন। নমস্কার।

ট্রাম এসে গেল।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউএর মোড় অবধি হেঁটে এলো দেবদত্ত। মাঝে মাঝে ফাঁকা রাস্তায় একা একা হাঁটতে ইচ্ছে করে তার।

চার-পাঁচটা দেখে একটা ফাঁকা ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই চলবে।

এমন কি রাত হয়েছে এখন।

ইচ্ছে করেই একটু দেরি করল দেবদত্ত।

অমিতাদের বাড়িতে সব সময় সে যেমন অসঙ্কোচে যেতে পারে, সুনন্দার ওখানে তেমন করে যাওয়া সম্ভব নয়।

সে-বাড়ির আর কারুর সংগে দেবত্তর আলাপ নেই।

তাই আগে অন্যান্য সকলে জড়ো হোক। দেবদত্ত পৌছবে সকলের শেষে।

দেশপ্রিয় পার্কের সামনে ট্রাম থেকে সে নামল। এখান থেকে হেঁটে যাবে পণ্ডিতিয়া প্লেস অবধি। তাহলে বোধহয় সে যা চায় তাই হবে।

মেঘলা দিন। অন্য কোন দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে মনে হয়। হাওয়া যেন বর্ষণের ঝাপ্টা খেয়ে ভিজে ছুটে আসছে।

তবু পথে লোক চলাচলের বিরাম নেই। রঙ বেরঙের নানা রকম দামী জামা কাপড় পরে সেজে গুজে ঘুরে ফিরছে অসংখ্য ছেলে মেয়ে। ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটে ছুটে পার্কে খেলা করছে।

আর শীতেও কাঁপছে অনেকে।

জীর্ণ কাপড় গায়ে জড়িয়ে শীতের সংগে সংগ্রাম করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফুটপাথে বসে মাটির খুরিতে মুড়ি আর গুড় ভাগ করে খাচ্ছে কোন পরিবার।

ছেলে-মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি মুঠি ভরে নিচ্ছে যে বাপ-মার জন্যে কিছু অবশিষ্ট থাকবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

তবু বাপ-মার মুখে চিন্তার রেখা নেই।

ছেলে মেয়েরা খাক যত পারে তাহলেই যেন পেট ভরে যাবে বাপ-মার।

দেবদত্ত দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সে-দৃশ্য দেখল।

এদের শোনাবার জন্যে কোন গান আছে তার।

নম্বর খুঁজতে হল না দেবদত্তকে।

পণ্ডিতিয়া প্লেসে ঢুকেই একটু দূরে সে দেখল একটা নতুন দোতলা বাড়ির গেটের কাছে বোধহয় তারই অপেক্ষায় সুনন্দা আর অমিতা দাঁড়িয়ে আছে।

যাক অমিতা এসে গেছে তাহলে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

বেশিক্ষণ নয়। আসুন—

আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। অনিল আসে নি অমিতা?

না, বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। নীলা এসেছে।

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে?

ভেতরে মাসিমার সংগে গল্প করছে।

ওরা ঘরে ঢোকবার সংগে সংগে নীলা সেখানে চলে এলো।

দেবদত্ত ভেবেছিল সুনন্দার মাও এসে বসবেন ওদের সংগে।

কিন্তু শেষ অবধি তিনি এলেন না।

আর কেউই এলো না।

ভালই হল। গানের চেয়ে আজ গল্প হবে বেশি। এ বাড়ির লোক তার গানের মূল্য কতখানি দেবে সে-সম্বন্ধে ভেতরে প্রবেশ করবার সংগে সংগে সন্দেহ জেগেছিল দেবদত্তর মনে।

কেন তা সে নিজেই জানে না।

ঘরের চারপাশে দেবদত্ত তাকিয়ে দেখতে লাগল। একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজান ঘর। সামান্য ত্রুটী চোখে পড়ে না।

দেয়ালের রঙের সংগে রঙ মিলিয়ে পর্দা টাঙান হয়েছে। হালকা নীল রঙ। সোফার রঙও তাই।

টেবিলে ঝকঝকে চাদর। বিলিতি নীল রঙের ফুলদানে শুধু সজীব শুভ্র রজনীগন্ধা।

দেবদত্ত অনেকক্ষণ ওই ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

চাকর ট্রেতে প্রত্যেকের জন্য নানা রকম দিশি-বিলিতি খাবারের প্লেট নিয়ে এলো।

সুনন্দা নিজে প্লেট তুলে দিল দেবদত্তর সামনে।

করেছেন কি? যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছি বলেই কি এত আয়োজন করেছেন?

আমি কিছু করি নি। যা করবার মা করেছেন! আমি শুধু ওই রেডিওগ্রামে আপনার রেকর্ড বাজিয়ে শুনেছি।

ঘরে একটা রেডিওগ্রাম রয়েছে বটে!

তাহলে আজ আর গান গাইবার দরকার কি? দেবদত্ত হেসে বলল, বারবার এক লোকের গান ভাল লাগবার কথা নয়।

তা কি হয়? আপনার মতো গায়ককে হাতের কাছে পেয়ে গান না শুনে ছেড়ে দেব, আমি কি এতই বোকা?

তোমরা থাক দেবুদা। সুনন্দা কিছু মনে করিস না ভাই, অমিতা বলল, আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যাব আজ।

কেন?

অনিলের বাবাকে দেখতে যেতে হবে। এক বুড়ি পিসিমা ছাড়া কেউ নেই ওর বাড়িতে—

তাহলে তুই আজ গাইবি না?

আমার গান তো অনেক শুনেছিস তুই!

খাওয়া শেষ হবার পর গান শোনাল দেবদত্ত। গলা আশ্চর্য রকম খুলে গেছে আজ ওর।

অমিতা শিগগির দেবদত্তর গলায় এমন গান শোনে নি।

সুনন্দা বলল, এসব গানের রেকর্ড নেই আপনার?

আপাতত নেই।

সুনন্দা মিষ্টি হেসে বলল, কেন? এমন গলায় যদি আপনি গান করেন তাহলে আপনার চেয়ে বড় গায়ক বোধহয় সারা বাংলায় আর কেউ থাকবে না।

দামী ফুলদানে রজনীগন্ধা গুলি স্থির হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে হেসে দেবদত্ত বলল, ধন্যবাদ। এবার আপনি গান করুন, আমরা শুনি।

সুনন্দা বলল, বলেছি তো, আমি একেবারেই গাইতে পারি না।

আবার হাসল দেবদত্ত, এমন কোন মেয়ে কি সত্যি কোথাও আছেন যিনি গুন গুন করে একটু-আধটু না গাইতে পারেন?

তা হয়তো নেই। কিন্তু আপনার মতো গায়কের সামনে সে গুন গুনানি শুনিয়ে কি লাভ?

একটা আবিষ্কার বলতে পারেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনে হয় আপনি গান গাইতে পারেন।

আপনি দেখছি আমাকে গান না শিখিয়ে ছাড়বেন না।

শিখুন না, ক্ষতি কি?

লাভও তো কিছু দেখছি না।

আগে শিখুন, লাভ লোকসানের কথা পরে ভাববেন।

বেশ। ভেবে দেখব।

সুনন্দা কিছুতেই গাইতে রাজি হল না।

অমিতা অনিলের বাড়ি যাবার জন্যে এক সময় উঠে দাঁড়াল।

নীলা বলল, আমার বাড়ি কবে যাবে দেবুদা?

তুমি বল?

কাল?

সুনন্দার দিকে তাকিয়ে দেবদত্ত বলল, বর্ষ বিদায় তো আপনার বাড়িতে হল, বর্ষ বরণ করতে নীলার বাড়িতে যাবেন কাল?

নিশ্চয়ই। কটার সময় নীলা?

যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। তিনটে-চারটের সময়? আমি অমিতা আর অনিলকেও খবর দেব।

যাকে খুশি খবর দিও। কিন্তু কাল তোমার ওখানে গানের চেয়ে গল্প হবে বেশি।

সুনন্দা হেসে বলল, আজও তো তাই হল।

দেবদত্তও হাসল, তবু চেষ্টা করে দেখুন, গল্পের মধ্যেই সুর খুঁজে পাবেন।

তা পাচ্ছি বটে।

নীলা বলল, আমরা বাড়ি বদলেছি দেবুদা। কালিঘাটে আমাদের নতুন বাড়ি তুমি বোধহয় চেন না—

সুনন্দা বাধা দিয়ে হালকা সুরে বলল, আমি চিনি। বলেন তো পথ দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি!

খুব ভাল কথা, দেবদত্ত হেসে বলল, তাহলে কাল দুপুরে কোথায় আপনার সংগে দেখা হবে বলুন?

কালিঘাটের কাছাকাছি কোথাও। আপনিই বলুন না?

দেবদত্ত একটু ভেবে বলল, রাসবিহারী অ্যাভিনিউএর মোড়ে যেখানে ট্রাম থামে সেখানে?

বেশ। খুব কাছেই নীলার বাড়ি।

প্রয়োজন না থাকলেও সুনন্দাকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিল দেবদত্ত, হয় তো লক্ষ করেছেন ট্রাম লাইনের ধারে দু একটা গাছ আছে—

জানি জানি!

আমি সেই গাছতলায় কাল তিনটের সময় আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

সুনন্দা হেসে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, গাছতলায়?

একজন গায়কের দাঁড়াবার যোগ্য জায়গা সেটাই তো আমার মনে হয়।

নীলার সংগে দেবদত্তও বিদায় নিতে চাচ্ছিল কিন্তু সুনন্দা অনুরোধ করল আর দু-একটা গান শোনাতে।

নীলা চলে গেল।

কিন্তু আর গান শোনাল না দেবদত্ত। সুনন্দার সংগে গল্প শুরু করে দিল।

একটু আগে কাপ ভাঙবার শব্দ শুনেছিল সে। তারপর বোধহয় সুনন্দার মার কণ্ঠস্বর। চাপা গলায় চাকরকে ধমক দিয়েছিলেন তিনি। সেই চাকরটাই বোধহয় ঘরে এলো শূন্য কাপ প্লেট তুলে নিতে।

দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

কৃতার্থ হয়ে সে উত্তর দিল, আজ্ঞে কমলাকান্ত।

এ বাড়িতে আর কখনও কোন গায়ককে কমলাকান্ত বোধহয় গান গাইতে শোনে নি। তাই ভয়ে ভয়ে বারবার সে দেবদত্তর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

সুনন্দা হেসে জিজ্ঞেস করল, ওর মধ্যে কি এত দেখলেন আপনি? ও কি গান গাইতে পারবে বলে মনে হয়?

দেবদত্ত বলল, সুর ওর মনেও বাজে নিশ্চয়ই। কিন্তু তা ধরতে পারবার ক্ষমতা আমার কোথায় ?

সেইদিনই ঠিক হল সপ্তাহে দুদিন সুনন্দাকে গান শেখাবে দেবদত্ত।

কাল থেকে নয়, পরের শনিবার থেকে নিয়ম করে সে আসবে এ বাড়িতে।

মাইনের কথাও জোর করে তুলল সুনন্দা।

আবার চা এনেছিল কমলাকান্ত। কিন্তু ভরা পেয়ালা পড়ে রইল যেমনকাব তেমন !

পণ্ডিতিয়া প্রেস থেকে বেরিয়ে দেবদত্ত যখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউএর ওপর এসে পড়ল তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। রাস্তার দুধারে দোকানের আলোগুলি ঝলমল করছে। চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। এ বাস্তার ওপর আলোর এমন আশ্চর্য সমারোহ আর কখনও লক্ষ করে নি দেবদত্ত।

দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ফুটপাথে সেই দুঃখী পরিবার আর নেই তখন।

তবু দেবদত্ত হাঁটতে লাগল।

আজ একেবারে শীত নেই।

বসন্তের হাওয়া দিয়েছে।

চারপাশে তাকিয়ে দেবদত্ত প্রকৃতির খেয়ালের কথা ভাবছিল। তিনটে বাজবার একটু আগেই সেই গাছ তলায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। মনে ভয় ছিল যদি দেরি হয়ে যায়, যদি সুনন্দা তাকে দেখতে না পায় !

একটার পর একটা ট্রাম আসছে। কোম্পানির লোক ট্রামের

গন্তব্য স্থান বুঝে লাইন এদিক-ওদিক করে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। জুতো পালিশ করবার জন্যে বাক্স হাতে ছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে।

ট্রামের শব্দ পেলেই পেছন ফিরে তাকাচ্ছে দেবদত্ত। তবে কি সে অনেক আগে এসে পড়েছে!

কে জানে! ঘড়ি নেই তার।

থেকে থেকে দেবদত্তর আজকের দিনটির কথা মনে হচ্ছে। পয়লা জানুয়ারী। নতুন বছর!

কোন মানে হয় না ভাববার তবু সে ভাবল, এ বছর কেমন কাটবে তার—কতখানি সার্থকতা আসবে জীবনে।

সুনন্দার মতো একটি ছাত্রী পেয়ে লাভ হল বৈকি তার। এ ছাত্রীটি বোধহয় কখনও তার মেজাজ একেবারে বিগড়ে দেবে না।

সুনন্দা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী। সুরের উৎস খুঁজে পেতে খুব বেশি দেরি হবে না। নানা কারণে হয়তো প্রকাশ করতে পারে নি কিন্তু গান শেখবার আগ্রহ কম নয় তার। কাল বারবার সে আগামী শনিবারের কথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

যেন দেবদত্ত ভুলে না যায়।

ভুলবে কেন সে?

তার গরজ কিছু কম নাকি! একজনকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে কে না চায়।

অবশ্য ছাত্রী সম্পর্কে অনেক নীরস অভিজ্ঞতা আছে দেবদত্তর। সেই কারণে সকলকে গান শেখাতে সে অনেক সময় ইতস্তত করেছে।

অভিভাবকরা তাকে প্রথমেই বলে দেন, বুঝলেন মাস্টারমশাই, একটু ঠিকঠাক করে দেবেন। শিগগির মেয়েটার বিয়ে দেব ভাবছি। লোকে যেন বোঝে গানে এর জন্ম থেকেই উৎসাহ। অনেকে গান ভালবাসে কি-না।

কিন্তু সে-ছাত্রীর গলা শুনে দেবদত্তর মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়! না, হাজার চেষ্টা করলেও কোন বধির মানুষও কখনও বিশ্বাস করবে না জন্ম থেকেই গানে তার ঝোঁক!

সে-বাড়ি থেকে একদিন বিনা নোটিশে দেবদত্তর চাকরি চলে যায়। কারণ মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আর যে বাড়িতে বিয়ের ঠিক হয়েছে সে-বাড়ির লোক গান একেবারেই পছন্দ করে না।

দেবদত্ত বেঁচে যায়।

মেয়ে সুখী হোক!

তারপর আবার দেবদত্তর খোঁজ পড়ে এমন মেয়ের জন্যে যার গানে সামান্য একটু ঝোঁক আছে বটে কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না।

অভিভাবক দেবদত্তকে রাখতে রাজি হলেও মেয়ে মুখ বাঁকায়। অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন সে-মেয়ে। গান যদি শিখতেই হয় তাহলে কোন প্রসিদ্ধ গায়কের কাছ থেকে শিখবে।

দেবদত্তর মতো নতুন গায়ক কি শেখাবে তাকে। আর তার কাছে সে শিখবেই বা কেন!

কাজেই দেবদত্তর চাকরি হয় না সেখানে।

আবার মাঝে মাঝে এমন অনেক গলা দেবদত্ত শোনে যে সে অবাক হয়ে যায়। কোন দিন যাকে কেউ গান শেখায় নি, গলার কাজ তার এমন হয় কেমন করে!

কিন্তু বাড়ির অবস্থা খারাপ। মেয়ের লেখাপড়া শেখবার খরচ জোগাতে প্রাণ বেরিয়ে যায় বাপ-মার। গানের মাস্টার রাখবার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

যে দু-একজন রাখে তারা বেশি টাকা দিতে পারে না। যা সামান্য দেয় তাও ঠিক সময় দেয় না। বাকি পড়ে মাসের পর মাস।

ছাত্র যে মাঝে মাঝে না জোটে তা নয়। কিন্তু দেবদত্ত নিজেই

এড়িয়ে যায় তাদের। অন্ত কোন গানে উৎসাহ দেখায় না তারা শুধু বায়স্কোপের গানগুলো ঝালিয়ে নিতে চায়।

বড়লোকের বেকার ছেলে। মোটা মাইনের লোভ আছে দেবদত্তর। কিন্তু তবু তেমন জায়গায় সে আর যায় না।

ছাত্র হোক, ছাত্রী হোক, গানে সত্যি উৎসাহ না থাকলে আর কাউকে হয় তো গান শেখাতে পারবে না দেবদত্ত।

যত টাকাই তারা দিক।

যত অভাবই তার থাক।

ঠিক তিনটের সময় রাসবিহারী অ্যাভিনিউএর মোড়ে সুনন্দা ট্রাম থেকে নামল।

দূরে দেবদত্ত দাঁড়িয়ে আছে।

দ্রুতপায়ে হেঁটে তার কাছে এসে সুনন্দা বলল, বড় দেরি হয়ে গেল, না?

জানি না। আমি বোধহয় বেশ আগে এসেছিলাম।

কেন শুধু শুধু কষ্ট করলেন? আমি তো বলেছিলাম তিনটের সময় আসব?

দেবদত্ত বলল, ইচ্ছে করেই একটু আগে এসেছিলাম। দেরি হয়ে গেলে পাছে আপনি মনে করেন গায়কদের সময়ের খেয়াল নেই—

পথ চলতে চলতে সুনন্দা অল্প হেসে বলল, আপনি গাছতলায় দাঁড়িয়ে না থাকলে আজ হয়তো আমার আসাই হত না।

কেন?

আমার এক বন্ধু হঠাৎ দিল্লী থেকে এসে পড়েছে।

তাঁকে নিয়ে এলেই তো পারতেন।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সুনন্দা বলল, আপনাকে নীলার ওখানে পৌঁছে দিয়েই আমি আজ চলে যাব।

দেবদত্ত বলল, কি আর করব বলুন? নতুন বছরের উৎসব আমাদের আর করা হল না।

লজ্জা পেয়ে সুনন্দা বলল, আমার জন্যে আপনাদের উৎসব বন্ধ থাকবে কেন? বন্ধু এসে না পড়লে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে থাকতাম।

দেবদত্ত কথা বলল না।

নীলাব বাড়ি এসে গেল।

ঘরে আর কেউ নেই।

অমিতা আসতে পারে নি। অনিলও এসে পৌঁছল না শেষ অবধি। সুনন্দা অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে।

কালিঘাটে তেতলা বাড়িব একটা ফ্ল্যাটে গোটা তিনেক ঘর। নীলার বিয়ে দিয়ে সুশীল বাবু এথানেই শান্তিতে বাস করছেন বছর কয়েক।

শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপেব বাড়িতে কোন মেয়ে মাঝে মাঝে এসে কিছুদিন থেকে না যায়। নীলাকে দেখে সুশীল বাবুও এমন একটা ধারণা করে খুশি হয়েছিলেন। স্ত্রী মারা যাবাব পর আর কোন আকর্ষণ নেই তাঁব সংসারে।

কিন্তু কয়েক দিনের জন্যে নীলা বাপের বাড়িতে আসে নি।

স্বামীর কাছে আব ফিরে যাবে না বলেই সে এসেছে।

দেবদত্ত তো জানে গানে কত উৎসাহ ছিল নীলার। গানের জন্যে সব তুচ্ছ করতে দ্বিধা বোধ করে নি সে। সেই কারণেই বিয়ে করে বাংলার বাইরে স্বামীর কর্মস্থলে যেতে তাব যথেষ্ট আপত্তি ছিল।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

নীলার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি গুঁড়ো হয়ে গেল পাত্রপক্ষের ঐশ্বর্যের ছটায়। মা-হারা একমাত্র মেয়ের বিয়ে যোগ্য ছেলের সংগেই দিলেন সুশীল বাবু।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নীলাকে বাঁধতে না পারলেও স্বামীর স্নেহ তার সহৃদয়তা হয় তো তাকে বাঁধতে পার তো।

কিন্তু সেদিক থেকেও কপালে শূন্য পড়ল তার।

এমন এক সংরক্ষণশীল পরিবারে তার বিয়ে হয়েছিল যে সেখানে গান গাওয়া চলেনা। বাড়ির বউ গান গায় একথা কেউ কল্পনা করতে পারে না সেখান।

তবু বাইরের গান বন্ধ করলেও যদি অন্তরের গান বাজিয়ে তুলতে পারত নীলার স্বামী তাহলে ব্যর্থতার গ্লানিতে সারা দিন রাত ছটফট করতে হত না তাকে।

দুই জগতের গান বন্ধ হবে কি তবে!

তার স্বামী নাকি আরও একটা বিয়ে করেছিল। আত্মহত্যা করে মরেছে সে-বউ।

এ খবর সুশীল বাবু জানতেন না। যখন জানলেন তখন নীলা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি চলে এসেছে।

করুক না দুবার বিয়ে। শুধু সেই কারণে একজনকে অমানুষ ভাববে এত ছোট মন নীলার নয়। আকস্মিক উত্তেজনায় সামান্য ব্যাপারে আত্মহত্যা করে থাকে কত লোক।

তাই গুরুতর আঘাত পেয়ে ভেঙে পড়ে নি নীলা।

অন্য দিক থেকে আঘাত আসতে লাগল একের পর এক। সব কিছু সহ্য করবার ক্ষমতা নীলার আছে কিন্তু স্থুল রুচির মানুষকে মানিয়ে নিয়ে ঘর করবার মতো সহ্য শক্তি হয় তো তার নেই।

নীলার স্বামী ভেবেছিল, বিত্তের অভাব নেই সুশীলবাবুর। একমাত্র মেয়ের বাপ সম্পর্কে এমনি ধারণা থাকে বটে অনেক মানুষের। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল। এমন কিছু সম্পত্তি সুশীল বাবু নীলার নামে রেখে যেতে পারবেন না যার পরিমাণ তার মতো বৈষয়িক লোকের মুখে হাসি ফোটাবে।

অকারণে অপরাধী হয়ে একজন মানুষের অত্যাচার সহ্য করবার মতো শিক্ষা নীলার নয়। তার সব সহ্যশক্তির অবসান হল যেদিন ঘটা করে তার সামনে সেই মানুষটি আর এক বিত্তশালী ব্যক্তির মেয়ের সংগে পুনর্বিবাহের আয়োজন করতে লাগল। সেই মেয়ের বাঁ পায়ে সামান্য খুঁত আছে শুধু।

নীলা বর্ত্তমান কালের মেয়ে।

এমন মধ্যযুগীয় ব্যাপার যে আধুনিক কালে ঘটতে পারে এবং তাকে তাতে অংশ গ্রহণ করতে হতে পারে সেকথা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল তার।

তাই প্রথম প্রথম নির্বাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সে দিন কাটিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, ঘটুক তার জীবনে অবিশ্বাস্য যত কিছু, ফুরিয়ে যাক সে সকলের অলক্ষ্যে, কতটুকু ক্ষতি হবে জগতের।

জগতের হয়তো কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু আর একজন স্বার্থপর মানুষের খামখেয়ালির জন্যে কেন ব্যর্থ হবে নীলার জীবন!

নিজের মূল্য বোধ তার বেড়ে গেল হঠাৎ।

একের অন্যায়ের দাম আর একজন কেন দেবে সমস্ত জীবন দিয়ে?

কিন্তু কি করবে নীলা? বাবার কাছে ফিরে আসবার কথা তখন ভাবতে পারে নি সে। সুশীল বাবু তাকে সমর্থন করবেন কি-না সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল তার।

সর্বস্ব হারালেও গান তো বন্ধ হয় না মানুষের।

সুর যেমন হোক, কোন না কোন গান সর্বক্ষণ অন্তরে বেজে চলে। সেই রাগিণী সম্বল করে নীলা কি বেঁচে থকতে পারবে না?

কেন আর একজনের হাতে থাকবে তার প্রতিদিনের সুখ দুঃখ পরিমাপের নিক্তি!

আর যদি থাকেই তাহলে মানুষের হাতে কেন, ভগবানের হাতে ইচ্ছে করে নীলা তুলে দেবে তার সম্পূর্ণ ভার।

তার অন্তর থেকে কে যেন গেয়ে উঠল—

তুম শুন দয়াল ম্‌হারী অরজি।
ভৌসাগরমে বহি জাত হুঁ,
কাঢ় তো থাঁরী মরজী॥
য়ো সংসার সগো নহিঁ কোঈ,
সাঁচা সগা রঘুবরজী॥
মাত পিতা অরু কুটুম্ব কবীলো,
সব মতলবকো গরজী॥
মীরাকী প্রভু অরজী শুন লো,
চরণ লগাও থাঁরী মরজী॥

হোক বন্ধ বাইরের গান, নীলার অন্তরের গান তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কোন আঘাত বোধ হয় আর তার গায়ে লাগবে না।

সে নিজের সংগে বোঝাপড়া করে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একা একা মনে মনে ভজন গান গাইতে গাইতে তার চোখের সামনে সুদূর অতীতের ছবি ফুটে উঠত।

রাজরানী মীরা। অন্তরের গানের মধ্যে দিয়েই তো তিনি পেতে চেয়েছিলেন ভগবানকে। রাজঐশ্বর্য, পার্থিব যত আকর্ষণ সব

কিছু ত্যাগ করে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে যুগ যুগ আগে তিনি যে ভজনগান গেয়েছিলেন আজও তার লয় নেই।

তাঁর তুলনায় কি ঐশ্বর্য আছে নীলার সংসারে! কোন আকর্ষণ নেই। মোহ নেই। মায়া নেই।

শুধু গান আছে। এই গান সম্বল করে সংসার ছেড়ে ঠাকুরের পায়ে সে-ও নিজেকে উৎসর্গ করবে। আশ্রয় নেবে কোন আশ্রমে। হৃদয়ের ভক্তি উজাড় করে গান দিয়ে ভগবানেব সেবা করবে।

এই কারণেই স্বামীর সংসার থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়ে নীলা কলকাতায় চলে আসে। প্রথমে এসে সে ওঠে বাপের বাড়িতেই।

ফল যা-ই হোক না কেন, বাবার কাছে কিছু গোপন করতে পারবে না সে। মেয়ের সম্বন্ধে সব কিছু সুশীল বাবুর জানা দরকার বৈকি। তিনিই তো ঘটা করে তার বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র কিছুদিন আগে।

সমস্ত কথা অসঙ্কোচ সুশীল বাবুকে জানাল নীলা। এবং ভবিষ্যতে সে কি করবে সে কথাও বলল।

নীলা কিছু বলবার আগেই সুশীল বাবু এখান ওখান থেকে সব কথাই শুনেছিলেন। তারপর ঠিক করেছিলেন মেয়েকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করবেন কি ব্যাপার।

নীলার কাছ থেকে সব শুনলেন তিনি। অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

অবশেষে গম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে বললেন, একটা অমানুষের জন্যে তোর জীবন ব্যর্থ হতে পারে না মা। তোর যে বিয়ে হয়েছিল সেকথা এই মুহূর্ত থেকে তুই ভুলে যা। আমি আবার তোর বিয়ে দেব—

বাবার কথা শুনে বাধা দিয়ে সভয়ে নীলা বলেছিল, না বাবা। ওকথা আমি ভাবতে পারি না। আমি আশ্রমে চলে যাব ঠিক করেই তোমার এখানে এসে উঠেছি।

সুশীল বাবু হঠাৎ হেসে উঠলেন, পাগলি মেয়ে! কেন আশ্রমে যাবি তুই? কোন দুঃখে?

কোন দুঃখের জন্যে নয় বাবা। আশ্রমে থাকতে আমার ভাল লাগবে।

স্থির চোখে নীলার দিকে তাকিয়ে সুশীল বাবু উত্তর দিয়েছিলেন, যদি তোর মনে তেমন ভক্তি থাকত আর তুই সংসার ছেড়ে যেতে চাইতিস তাহলে আমি তোকে বাধা দিতাম না। কিন্তু আজ যে তুই দায়ে পড়ে সমাজ আর সংসার এড়িয়ে পালিয়ে যেতে চাইছিস। কেন তোর এত লজ্জা মা? তুই তো কোন অন্যায় করিস নি। সব জায়গায় মাথা উঁচু করে চলবার অধিকার তোর আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুশীল বাবু আবার বলেছিলেন, এ-সংসারে থেকে আবার গান নিয়ে মেতে যা, সব দুঃখ ভুলে যাবি।

কিন্তু কোন গান? কার গান?

দুঃখের গান নীলা ইচ্ছে করে গাইবে না। কারণ নিজেকে সে কিছুতেই দুঃখী বলে স্বীকার করবে না। প্রেমের গান গাইতে মন চাইবে না। বিরহের গানের কথা মনে হলে হাসি আসবে।

আর ভগবানের গান?

তেমন করে ভগবানকেও বুঝি আর ডাকতে পারবে না সে। স্বামীর সংসার থেকে বেরিয়ে আসবার আগে যখন সে আশ্রমে গিয়ে বাস করবার কথা ভেবেছিল তখন বাবার বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল তার।

আজ সন্দেহ ঘুচে গেছে।

নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জোর করে মনে যে ভক্তির জোয়ার আনবার চেষ্টা করেছিল, বাবার বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে তা মুছে গেছে।

সে-পরিকল্পনা আজ হাস্যকর মনে হয় নীলার।

কিন্তু গান সে গাইবে।

গান তাকে গাইতে হবেই।

নিজেকে সে মাতিয়ে দেবে।

বিলিয়ে দেবে।

ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার, হতাশা-বেদনার গানে নয়।

সমষ্টির বাঁচবার গানে।

তার জন্যে দুঃখের পর দুঃখ আসুক নীলার জীবনে। সে বিচলিত হবে না।

ভেঙে পড়বে না।

জীবনের শেষ দিন অবধি অক্লান্ত কণ্ঠস্বরে গেয়ে যাবে জীবনেরই গান।

বাঁশধানি পেট্রল পাম্প ছাড়িয়ে আর একটু দূরে এখন একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

এদিকটা আগে একেবারে জঙ্গল ছিল বললেই চলে। শুধু স্ফূর্তি করবার জন্যে বোধহয় দু চার জন পয়সাওলা লোক সস্তায় জমি কিনে কয়েকটা বিরাট বাগান বাড়ি করে রেখেছিল।

মাঝে মাঝে গাড়ি হাঁকিয়ে সদলবলে তারা আসত এদিকে।

ছু চার দিন থেকে ফুর্তি করে বাবুর্চির রান্না খেয়ে ফিরে যেত আবার। কিছুদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে আরও অনেক বড় বড় বাড়ি মাথা তুলল এ পাড়ায়। ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে আর চিত্রতারকার দল ফাঁকা জায়গা বলে গা-হাত-পা ছড়িয়ে বাস করতে এল এ-পাড়ায়।

কিন্তু পাড়া কোথায়?

যে লোকগুলি এদিকে এল তাদের দিন কাটে অন্য প্রান্তে। গাড়িতে সাহেবী দোকান থেকে তারা বাজার করে, চাকরি করে আপিস পাড়ায়। এদিকটা শুধু যেন তাদেব বিশ্রামের জায়গা। আর চিত্রতারকারা মুখে রঙ মেখে রঙীন সাড়ির আঁচল উড়িয়ে কাছা-কাছি স্টুডিওতে লাফিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু কে দেখে তাদের রূপ যৌবন!

যারা দেখে তারা কাছে ঘেঁসতে পারে না।

ট্রাম লাইন নেই। গোটা দুই বাস চলে। শুধু একটা যায় শহরের দিকে। বাসের গা ঘেঁসে মাঝে মাঝে আশ্চর্য রকম বিরাট মোটর গাড়ি বেরিয়ে যায়।

কে গেল?

বুলবুল দেবী?

মাড়োয়ারি?

বাগান বাড়ির মালিক?

কে জানে!

তবু রাস্তার ধারে বাজার বসে। টাটকা তরকারি ফল মাছ মাথায় করে কত দূর থেকে দুটো পয়সা করতে আসে লোক। যদি কেউ কেনে এই আশায়।

সারা দিন রোদ ঝলসায়, অপরাহ্নে সূর্য আকাশ রাঙায়। সন্ধ্যেবেলা ঝিঁঝিঁ ডাকে। অন্ধকার ঘন হলে সমস্বরে শেয়াল গান গায়।

আর কি আছে এ পাড়ায়!

আছে।

প্রথমে ছিল না। কিন্তু দেখতে দেখতে তৈরি হল সস্তা একতলা কাঠের বাড়ি, মাটির ঘর। আর কত কম পয়সা ব্যয় করে বাস করা যায় সেই চিন্তায় ঘুম ছুটে গেল ঘর বাড়ি খুইয়ে অভাবের ধাক্কা খেতে খেতে এ পাড়ায় এসে যারা আছাড় খেয়ে পড়ল তাদের।

এখন বাসে ওঠা কষ্টকর।

নির্জনতা উপভোগ করবার জন্যে যারা এ-পাড়ায় প্রথমে বাড়ি করেছিল হৈ-হল্লা হুল্লোড়ে তাদের কান এখন ঝালাপালা হয়ে যায়। শুধু মানুষ আর মানুষ।

এ পাড়ায় এসে কত রকমের মানুষ যে মাথা গুঁজেছে সেই সস্তায় গড়া একই ধরনের ঘরে!

নিখিলের সংগে আলোচনা করে অমিতা এ পাড়ায় জলসার ব্যবস্থা করেছিল।

বছর কয়েক হল নিখিল বাস করতে এসেছে এখানে। তার বয়স এখনও তিরিশ পার হয় নি। কিন্তু এই বয়সেই জীবনের অনেক রূঢ় রূপ দেখেছে সে। পূর্ব বঙ্গ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতায় বাধ্য হয়ে এসেছে কোন রকমে দিন কাটাতে। দিন ঠিক কেটে যায় বটে। কেটে কেটে বুকে গাঁথা হয়ে যায় প্রতিটি দিন। আরও দিন কাটবে।

কাটুক। নিখিলকে মারা কি অতই সোজা!

সর্বস্ব খোয়ালেও তার বুকের তেজ হরণ করবে কে। আর কিছু না থাক শুধু তেজ সম্বল করে নিখিল বেঁচে থাকবে ঠিক।

বেঁচে তো আছেই। সে একা কেন? তার চেয়ে হাজার ভাল অবস্থার অসংখ লোক!

কে ভেবেছিল তাদের গ্রামের জমিদার গোষ্ঠি এসে বাসা বাঁধবে তারই পাশের ঘরে? তার মত শাক ভাত খেয়ে কাটাবে দিনের পর দিন?

নিখিলের ষাট বছরের বুড়ো বাপ আজও লাঠি ঠক ঠক করে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে ঘরে অতীত ঐশ্বর্যের গল্প করে।

কি না ছিল তাদের! রূপোর থালা, সোনার বাটি, আরও কত কি।

জমিদার-গিন্নি নাকি সারাদিন কাঁদে। এই লজ্জাকর পরিবেশে কেন ভগবান তাদের এনে ফেললেন! কেন মৃত্যু হলনা তাদের।

কারুর সামনে দারিদ্র্যের লজ্জায় মুখ বের করতে চায় না তারা। চোরের মত লুকিয়ে থাকে।

কার অভিশাপ এসে পড়ল তাদের সংসারে! তছনছ হয়ে গেল সব। মাত্র কিছু দিন আগে তারা কল্পনা করতে পারে নি এমন অবস্থা তাদের হবে।

নিখিল কিন্তু বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। খোঁজ নেয় প্রতিবেশির। যেচে আলাপ করে। কারুর অভাব-অভিযোগ থাকলে ধৈর্য ধরে শোনে। সান্ত্বনা দেয়।

এই অগোছাল পরিবেশের মধ্যেও নিজে সে প্রায় উপোস করে কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাশ করল। তারপর একটা নতুন খবরের কাগজের আপিসে চাকরি জুটিয়ে নিল। মাইনে তেমন কিছু না পেলেও খরচ কোন রকমে চালিয়ে নেয় নিখিল। হাসি লেগে থাকে তার মুখে সব সময়।

না হেসে করবে কি? কেঁদে কেঁদে বুক চাপড়াবে? না নিজের ভাগ্যকে ধিকার দেবে?

ওসব করতে মন চায় না নিখিলের। সে শুধু সতর্ক থাকে। দুই চোখ খুলে চলা ফেরা করে। এ বাড়িতে যেন আর কেউ কখনও

কোন ফাঁক দিয়ে মাথা না গলায়। তাদের আবার গৃহহীন না করে।

বিশৃঙ্খল পরিবেশে জোর করে গুছিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় নিখিলের সারাদিন কাটে।

পয়সা খরচ করে আনন্দ পাবার সাধ্য নেই নিখিলের প্রতিবেশিদের।

তাই এখানে গানের জলসা হবে শুনে হাসি ফুটে উঠল তাদের মুখে।

সকলেই নিখিলকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জমিদার-বাড়ি থেকে সাতরঞ্চিও এল। শীতের হাওয়া ঠেকাবার জন্যে চারপাশ পুরু চাদর দিয়ে ঘিরে দেয়া হল।

জলসা হবে নিখিলের বাড়ির ফাঁকা জায়গায়।

আসলে কি ব্যাপার হবে অনেকে সে-কথাটাই বুঝতে পারছিল না।

গান হবে। কিন্তু কেমন গান? গাইবেই বা কারা?

ও বাবা নিখিল, প্রৌঢ় জমিদার এক সময় নিখিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, বলি ভাল গান হবে তো? কীর্তন-টীর্তন দু একটা শোনাতে বল বাপু—

নিখিল কথা না বলে হেসে মাথা নাড়ে শুধু।

পায়জামা পরা গুটিকয় ছোকরা নিখিলের কাছে এগিয়ে আসে, মেয়েরাও আসবে নাকি শুনলাম নিখিলদা? এরা কারা?

নিখিল বলে, দেবদত্ত, অনিল চৌধুরী, অমিতা—এদের নাম শুনেছিস?

শোনা শোনা মনে হচ্ছে যেন।

ভাল করে শুনিস আজ।

বাঃ শুনব না? মেয়েরা গাইতে আসবে—

নিখিল আবার নিজের কাজে মন দেয়।

সন্ধ্যের অনেক আগেই আসর একেবারে ভরে গেল। পাড়ার কেউ আর আসতে বাকি রাখে নি। জমিদার বাড়ির সকলেই এল একে একে।

আর যারা এল তাদের মধ্যে আবার অনেকের গান শোনার ম্ত না ইচ্ছে মজা দেখার সাধ তার চেয়ে বেশি।

দেখা যাক কারা আসে।

শোনা যাক কি গান গায়।

যেন শীতকাল নয়।

যেন ঠাণ্ডা বাতাস বয় না হু হু করে।

ব্যর্থ হয় নি কারুর জীবন।

যা হারাল তুচ্ছ তা লাভের হিসাবে।

কতটুকু জানা ছিল জীবনের!

মানুষ ছিল দম্ভ নিয়ে ভাগে ভাগে আলাদা হয়ে।

অন্ধের মতো স্বপ্ন দেখত অর্থ যশের ভুয়ো জীবনের।

যারা মেষ করে তাদের চরণে বিকত হৃদয়।

আজ খসে গেছে সব আবরণ।

নিদারুণ ক্ষতি বাইরে হয়েছে সে কথা ঠিক। তবু ভিৎ পাকা হল, গাঁথা দৃঢ় হল অন্তরের।

ঘর ভাঙেনি তো একজনের।

ঘর ভেঙে গেছে লক্ষ জনের। তারা দিকে দিকে ছড়াল। মনে মনে হল এক।

এক সাথে ঘর খোঁজে। ঘর চায়।

চায় নির্ভর।

সুখের মাঝে জানা কি যায় অন্যকে ?
একার শক্তি কতটুকু দেয় আর।
কঠিন দুঃখে অন্যকে চেনে সর্বহারার দল।

বহুর শক্তি জ্বালাল প্রাণের আলো।
দূর হল অন্ধকার জীবনের।
এ আলো ছড়াল ঘরের বাইরে।
এ আলো ছড়াল দেশে-বিদেশে।

জীবনের আলো। শক্তির আলো। এ আলো জ্বালাল নির্ভীক যত আশ্রয়হীন!

এ আলো নেভে না অন্ধকারের ঝড়ে!

নীলা অমিতা অনিল দেবদত্ত গাইল একে একে মনপ্রাণ ঢেলে যত দরদ উজাড় করে দিয়ে। তানপুরার তারে আঙুলের মন্থর ওঠা নামা যেন কোন দিন থামবে না।

কারুর মুখে কথা নেই। গান শেষ করে এরা চুপ করে বসে রইল।

সত্যি এখন আর তত শীত লাগছে না কারুর।

জমিদার গিন্নি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। আর ওই তানপুরাটার দাম কোটি টাকা মনে হচ্ছে প্রৌঢ় জমিদারের। পায়জামা পরা ছোকরারা মুগ্ধ বিস্ময়ে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারল না নিখিলের ষাট বছরের বুঁড়ো বাপ। লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

বুড়ো হাড়ে হঠাৎ যেন কাঁপন লেগেছে। চোখে অশ্রু জমে উঠছে। বুড়ো কিছু একটা করতে চায় কিন্তু কি যে করবে হঠাৎ ঠিক করে উঠতে পারছে না।

স্থান কাল ভুলে লাঠি ঠক ঠক করে বুড়ো এসে সজোরে জড়িয়ে ধরল দেবদত্তকে, কি দেব তোমাদের বল? কি দেব? কিছুই যে নেই আমাদের—

দেবদত্ত বলল, আশীর্বাদ করুন।

দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করছি! কী গান শোনালে বাবা! দেখছ না বুড়ো হাড়ে কী সাংঘাতিক জোর পাচ্ছি! দীর্ঘজীবি হও! জয় হোক তোমাদের—এতটা বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেলে, সব গেছে, কিন্তু কত শক্তি বেড়েছে আমাদের সে-কথাটাই তো গোপন ছিল এতদিন। তুমি কলির গৌরাঙ্গ। গান গেয়ে তুমি আমাদের মতো আধমরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলবে—

বুড়োর বাঁধন আলগা হয় না অনেকক্ষণ।

আজ দেবদত্ত নিজকে ধন্য মনে করছে। সার্থক হয়েছে ওদের উদ্যম।

অনিল ঠিক কথাই বলেছিল। সাজান ঘরে সখের জলসা না করে ওদের বেরিয়ে আসতে হবে বিশৃঙ্খল হাটের মাঝে। তাহলে আজকের মতো অভিনন্দন ওরা পাবে।

এখন থেকে এমনি করেই নির্ভীক জীবনের গান গেয়ে যাবে দেবদত্ত —এমনি করেই পাবে অগণিত জনের সমর্থন।

আর কিছু চাই না তার।

বাড়ি ফিরতে তারাময়ী দেবদত্তকে বললেন, কোথায় ঘুরে বেড়াস তুই? এতটুকু দায়িত্ব জ্ঞান নেই তোর?

হঠাৎ মার মেজাজ কেন বিগড়ে গেল সেকথা বুঝতে না পেরে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, কি হল?

ছি ছি, কি করিস বল তো? এই রকম করে আর একজনের সময় শুধু শুধু নষ্ট করতে হয়? সুনন্দাকে আজ থেকে তোর না গান শেখাবার কথা? কষ্ট করে এতদূর এসে ফিরে যেতে হল বেচারিকে। তোর টেবিলের ওপরে চিঠি লিখে রেখে গেছে দেখ গিয়ে। পুরো মাইনে বোধহয় দেবে না। সংসারের কথা কবে আর ভাববি তুই?

দেবদত্ত আর এক মিনিটও সেখানে দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে সুনন্দার চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে লাগল।

বড় ভুল হয়ে গেছে তার। আজ থেকে সুনন্দা যে গান শিখতে আসবে সে কথাটা একেবারেই খেয়াল ছিল না। আগে মনে পড়লে ওকে টেলিফোন করে না হয় একটা বন্দোবস্ত করা যেত।

সুনন্দা লিখেছে,

আজ এসে আপনাকে পেলাম না।

এবার অবশ্য মাইনে দেবার আগে আজকের হিসেব আপনার সংগে আলোচনা করে নেব।

কেননা অপমান জ্ঞানের মাত্রা বুঝে পুরো মাইনে দেওয়া উচিত হবে কিনা সেকথা আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোঝা কঠিন।

কাল আবার যথাসময় আসব।

চিঠি পড়ে আপন মনে হাসল দেবদত্ত। সুযোগ বুঝে সুনন্দা কৌশলে পাল্টা আক্রমণ করেছে। এবার আর দেবদত্তর মুখ খোলবার উপায় নেই।

মা নিশ্চয়ই চিঠিটা পড়েছেন। তাই মাইনের কথা ভেবে বিচলিত হচ্ছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার তিনি আর কতটুকু জানেন।

চিঠিটা যত্ন করে তুলে রাখতে ইচ্ছে হল দেবদত্তর।

নিখিলের বাবার বলা কথা মনে পড়ছে দেবদত্তর, তুমি কলির গৌরাঙ্গ। আর নীলা ভেবেছিল মীরার কথা।

গৌরাঙ্গ আর মীরা! নিস্তব্ধ রাত্রে তানপুরার তারে মৃদু ঝঙ্কার তুলতে তুলতে এই দুজনের কথাই ভাবছে দেবদত্ত।

দুজনেই যেন সংগীতের মূর্ত রূপ। মূর্ত প্রেম। অন্তর উজাড় করা ভক্তির গান গেয়ে অনির্বান আলো জালিয়ে তুলেছিলেন শত শত মানুষের মনে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জীবনে এনেছিলেন সংহতি। ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির কল্যাণে কঠিন সন্ন্যাস বরণ করেছিলেন। তা না করলে ভক্তির গান তো গাওয়া যায় না—সুর বাঁধা যায় না ব্যাপক জীবনের।

দেবদত্তর মনে তো ভক্তির সুরই বাজে। ভগবানের অন্বেষণ করে সে মানুষের সম্মিলিত শক্তির মধ্যে। প্রতিকূল পরিবেশে বিশৃঙ্খল জীবনে কৃষ্ণেরই দর্শন পেতে চায়।

হে প্রিয়, (আমার জীবনে) তোমার আরতি হোক। তোমার নামের আরতি সকাল-সন্ধ্যা আমার অন্তরে হোক। এ দেহকে দীপ করব, মনকে করব বাতি। প্রেমের তৈল জ্বালাব, সে-দীপ দিনরাত্রি জ্বলবে। জ্ঞানের পাটী বিছিয়ে বসব, হরিতে রতি ভিক্ষা করে সাজিয়ে নেব। তোমার জন্যে, হে প্রিয়, ধন যৌবন উৎসর্গ করব।

দেবদত্তর কণ্ঠে মীরার ভজন কাঁপে—

পিয়া মোহি আরত তেরী হো।
আরত তেরী নামকী, মোহি সাঁঝ সবেরী হো॥

ম্যা তনকে দিওলা করু, মনসা করু বাতি হো।
তেল জলাউঁ প্রেমকো, বালু দিন রাতি হো॥
পাটিয়া পাড়ু জানকী, মতি মাগো সবারু হো।
পিয়া তেরে কারণ ধন জোবন বারু হো॥

গান শেষ হবার পর দেবদত্ত লক্ষ করল ভবতোষ বাবু সাবধানে দরজার কাছ থেকে সরে গেলেন।

সে যখন এই বিশেষ ভজন গায় তখন মন্ত্রচালিতের মতো তিনি চুপিচুপি এসে দরজার বাইরে দাঁড়ান। সতর্ক থাকেন যেন দেবদত্ত তাঁকে দেখতে না পায়।

ভবতোষ বাবু যে দেবদত্তকে গায়ক বলে স্বীকার করেন আর ভজনের সুর যে তাঁকে সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে ছেলের একেবারে কাছে টেনে আনে সেকথা অন্য কেউ জানতে পারলে দম্ভে আঘাত লাগবে তাঁর।

কিন্তু দেবদত্ত জানতে পারে। হয় তো মনে মনে বিশ্লেষণ করে আর একটু বেশি বুঝে নেয়।

দম্ভ আর অভাব প্রাচীর তুলেছে বাপ-ছেলের মাঝখানে। দেবদত্তর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিলে হার হবে ভবতোষ বাবুর। তাহলে সংসারের অভাবের জন্তে ছেলেকে দায়ী করবার মুখ থাকবে না তাঁর।

কিন্তু দম্ভ আর অভাবের উর্ধে সাদা মনের যে অনুভূতি তার বিনাশ নেই। দৈনন্দিন বাধা বিঘ্ন জীবনের পরিধি যতই সংকীর্ণ করুক, মনকে তো দাবিয়ে রাখতে পারে না।

বাধার প্রাচীর টুকরো টুকরো করে মনের মুক্তি আসুক দেবদত্তর প্রতি মুহূর্তের গানে।

সব দুঃখ আর অভাবের অবসান হোক।

শীত কমে গেছে। এ বছরে ঠাণ্ডা একেবারেই পড়ল না কলকাতায়। পড়বার সম্ভাবনাও নেই। আর কয়েক দিন পর ফাল্গুন এসে যাবে।

তবু কুয়াশা জমেছে। অল্প রোদে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চার পাশ। দেবদত্তর ঘুম ভাঙল। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হল না হঠাৎ। পাশ ফিরে চুপচাপ ও শুয়ে রইল।

আর প্রত্যেকেই উঠেছে এর মধ্যে। ভবতোষ বাবু হয় তো বাজারে বেরিয়ে গেছেন। সতী সাহায্য করছে মাকে। একটানা কলের জল পড়ে যাচ্ছে। গয়লা কড়া নেড়ে নিজের আবির্ভাব জানাচ্ছে। সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ করে খবরের কাগজের হকার চিৎকার করছে।

এক হাতে খবরের কাগজ আর অন্য হাতে চা নিয়ে সতী দরজা ঠেলে দেবদত্তর ঘরে ঢুকল। আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে! দেবদত্ত ভাবল, কে বলে চাকরি করলে মেয়েদের চেহারা কঠিন হয়ে পড়ে! আরও মিষ্টি দেখতে হয়েছে সতী।

যাও দাদা, শিগগির মুখ ধুয়ে এস, চা জুড়িয়ে যাবে।

আজ তুই চা ঘরে বয়ে আনলি কেন সতী?

মৃদু হেসে সতী বলল, কেন আনতে নেই? আরও কি এনেছি দেখ না—

শুধু শুধু এত করলি কেন? লুচি অমলেট—সকালে আমি এত খাই কখনও?

না হয় একদিন খেলেই। আমি যখন কষ্ট করে করতে পেরেছি তখন খেতে তোমার কষ্ট হবে না।

কষ্ট হবে কেন, দেবদত্ত বলল চা-টা চাপা দিয়ে রাখ, আমি মুখ ধুয়ে আসছি এখুনি।

খুব অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো দেবদত্ত। সতী গালে হাত দিয়ে তখনও চা আগলে বসে আছে। কি এত ভাবে মেয়েটা দিন রাত গম্ভীর হয়ে!

এখনও বসে আছিস যে? আপিস নেই আজ?

ম্লান হেসে সতী বলল, আজ রবিবার।

আরে তাই তো! তাহলে আজ সারা দিন বাড়ি বসে বিশ্রাম কর। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করা ভাল।

মুখ নামিয়ে সতী বলল, আজ আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাব। কাল সকাল বেলা উঠে তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না।

পাগলি মেয়ে! তোকে কতবার বলেছি আজে বাজে কথা ভেবে মন খারাপ করবি না তবু আমার কথা শুনিস না কেন তুই? আবার কে কি বলল?

কেউ কিছু বলে নি। আমি খুশি মনেই চলে যাচ্ছি দাদা। তপন বেচারি নানা অসুবিধার মধ্যে আছে। আমার দিক থেকে দেরি করে ওর অসুবিধা বাড়ান আর বোধহয় ঠিক নয়।

দেবদত্ত হেসে বলল, ওরে মুখপুড়ি, তাই বল। বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছিস? তা আমাকে এতদিন কিছু বলিস নি কেন?

মাথা না তুলে খুব আস্তে সতী বলল, কিছুই ঠিক ছিল না। ওর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ছে আর দেখবার কেউ নেই বলে কাল বিকেলে কথা দিলাম।

একবারে রাতারাতি ব্যবস্থা পাকা করে ফেললি। কবে দিন ঠিক করেছিস?

আজ।

বলিস কি? আজ বিয়ে আর তুই এখনও গা এলিয়ে চুপচাপ বসে আছিস?

দেবদত্তকে আস্তে কথা বলতে ইসারা করে সতী ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। না, ধারে কাছে কেউ নেই। ওদের কথা কেউ শুনতে পায়নি।

কোন ভূমিকা না করে স্পষ্ট ভাষায় সতী দেবদত্তকে সব কথা জানাল একে একে।

প্রথমে ও ঠিক করেছিল মা-বাবাকে না জানিয়ে কিছু করবে না। সে জানে একথা শুনলে বাড়িতে আগুন জ্বলে যাবে। তপনকে কিছুতেই স্বীকার করবেন না ওঁরা। হয়তো কোনদিনও নয়।

না করুন। জ্বলুক আগুন। সব সহ্য করবে সতী। একদিন বৈ তো নয়। তবু সে চোরের মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে না। কারণ কোন অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছে না সে। ন্যায়-অন্যায় বোঝবার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার।

কিন্তু নানা দিক ভেবে হঠাৎ মত বদলে গেল সতীর। বিয়ের কথা মা-বাবাকে জানাবার ভার নিতে হবে দেবদত্তকে।

আজ বিয়ে। আজ যদি সতী ওঁদের কিছু বলে তাহলে রাগের তোড়ে অনেক কিছুই করতে পারেন ভবতোষ বাবু। আর তাহলে শেষ অবধি বিয়ে পণ্ড হবার সম্ভাবনা।

ওদিকে তপন খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব আয়োজন করে বসে আছে। এখন যদি মা-বাবা অঘটন ঘটান তাহলে কোথাও মুখ দেখাতে পারবে না সতী। তাই বিয়ে হয়ে যাবার পর দেবদত্তকে ওঁদের বলতে হবে সব কথা।

সতী তাকে এত কথা এমন করে বলতে পারছে কারণ সে জানে দেবদত্ত তার কাজে বাধা দেবে না, সে তাকে আশীর্বাদ করবে।

জলে চোখ ভরে উঠল সতীর। আর কিছু বলতে পারল না সে।

প্রায় চারটের সময় বাড়ি ফিরে এল দেবদত্ত।

ম্লান অপরাহ্ন। শীত নেই। সূর্যও নেই। আকাশে মেঘ জমে আছে। মা-বাবাকে কেমন করে এত বড খবর জানাবে সেকথা ভাবছিল দেবদত্ত।

বিশেষ কাজে ছুটির দিনেও আপিস যেতে হচ্ছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সতী। দেবদত্ত কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেনি। সে কখন কোথায় যায় না যায় তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ।

মা-বাবাকে জানিয়ে গেলেই হয় তো ভাল করত সতী। অন্তত সে যে শিগগির বিয়ে করবে কিছুদিন আগে থেকে এমন একটা ইংগিত দিতে পারত ওঁদের।

দেবদত্ত ঠিক বুঝতে পারছেনা কি ভাবে খবরটা গ্রহণ করবেন তাঁরা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেয়ে বিয়ে করে বসল—এমন ঘটনা এ বংশে আর কখনও ঘটে নি।

যা-ই ঘটুক, জানাতে তো হবেই ওদের। আর দেবদত্ত যখন ভার নিয়েছে তখন কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার।

বিয়ের সময় করুণ চোখে সতী তাকিয়েছিল দেবদত্তর দিকে।

আজকে বিয়ে করবার কথা বোধ হয় ওরা কেউই আগে থেকে ভেবে রাখে নি। তাই তেমন আয়োজন করতে পারে নি তপন। কিংবা ইচ্ছে করেই সতী করতে দেয় নি কে জানে।

প্রৌঢ় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তপনের বাড়িতে এসে বিয়ে দিলেন। তপনের দুই বন্ধু আর দেবদত্ত সাক্ষী হয়ে যথাসময়ে সই করল বিয়ের ফরমে।

তপনের মা-বাবার সংগে আলাপ হল দেবদত্তর। বেশি আয়োজন

করা হল না বলে ওদের লজ্জা যেন সব চেয়ে বেশি। দেবদত্তকে ওরা বারবার বললেন সে-কথা।

সকলের সংগে আলাপ করে দেবদত্ত নিশ্চিন্ত হল। সতী সুখী হবে। হয়তো আজ বিয়ের সময় ওর মুখ করুণ দেখাত না যদি মা বাবা সর্বান্তকরণে ওকে আশীর্বাদ করে আজকের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন।

হাজার হলেও সতী এই দেশেরই মেয়ে। ওর মনের সংস্কার যাবে কোথায়! যে পরিবারে ও বেড়ে উঠেছে সেখানে সংস্কারের জট নিমেষে নিমেষে মনে জড়িয়ে যায়। সে-জট খোলা যায় না। সতীর মত মেয়ে রাতারাতি খুলতে পারে না।

ও চিৎকার করে। বিদ্রোহ করে। সব বন্ধন ছিন্ন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সই করে বিয়ে করে বটে কিন্তু তারপর হঠাৎ একসময় ওর কাছেই সব ব্যাপারটা বড় করুণ বলে মনে হয়।

মা-বাবা যদি আশীর্বাদ না করেন, সকলে যদি আনন্দের ভাগ না নেয় তাহলে কিসের উৎসব?

মা-বাবার অলক্ষ্যে চোরের মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে শুভ বিবাহের উৎসব মনপ্রাণ দিয়ে করতে পারে না সতীর মতো মেয়ে।

ওর মনে পড়ে বন্ধু বান্ধবের বিয়ের কথা!

সানাই-এ একটানা কান্নার সুর বাজে। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। উলু দেয় আত্মীয়ারা। গুরুজনেরা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করেন। নানা সাজে উৎসবে যোগ দিতে অতিথি আসে একের পর এক। আর সলাজ মুখে বিয়ের কনে শুভ লগ্নের প্রতীক্ষা করে।

আজ তো তারই দিন।

তাই নিজের বিয়ে উৎসব বলে মনে করতে বেধে যায় সতীর।

একদিকে সর্বজয়ী প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে সংস্কার যেন হিম ছড়িয়ে দেয় মনের ওপর।

সে ম্লান চোখে তাকিয়ে থাকে দেবদত্তর দিকে।

আর দেবদত্ত ভাবে সংস্কারের বিপুল শক্তির কথা। তার মনে হয় সংস্কারের অন্য নাম দম্ভ। আজ যদি মা-বাবা দাঁড়িয়ে সতীর বিয়ে দিতেন তাহলে অনুষ্ঠানের রূপ পাল্টে যেত।

কিন্তু কিছুতেই সে-কাজ করতে পারতেন না তাঁরা। মেয়ের সুখের চেয়ে সংস্কারে দম্ভ প্রধান তাঁদের কাছে।

মনের অমিল হলেও জাতকুল মিলিয়ে বিয়ে করতে হবে। চিরদিন যখন মা-বাবা পাত্র ঠিক করছেন তখন অন্য জাতে বিয়ে করা চলবে না।

আর ঠিক বয়সে পাত্রের সন্ধান না আনতে পারলে মেয়েকে খোঁটা খেতে হবে রূপ-গুণের।

যদি মেয়ে জাতকুলের বেড়া ভেঙে সব দিক থেকে ভাল ছেলেকে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে সুখী হয় তাহলে মা-বাবা নিজেদের অক্ষমতা চাপা দেন সংস্কারের দম্ভের আবরণে।

দেবদত্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে কবে একে একে সব বেড়া ভেঙে অনেক সহজ হয়ে যাবে সুখের পথ!

তবু সতী মা-বাবার কথা ভুলতে পারে নি। তাঁরা আঘাত পাবেন মনে করে তার চোখে জল জমে উঠেছিল। আজ থেকে ওঁদের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

বারবার দেবদত্তকে সতী বলেছিল, একটু গুছিয়ে বলো দাদা। গিয়েই হঠাৎ দুম করে কিছু বলে বস না যেন।

না রে।

মা-বাবাকে তুমি সামলাবে। খবর শুনে ওঁরা একেবারে ভেঙে পড়বেন।

আমি সব বুঝিয়ে বলব।

তবু সতীর ভাবনা যায় না।

যত স্বাভাবিক স্বরে বলতে পারা যায়, যত সহজ করে প্রসংগ তোলা যায়—খুব অল্প কথায় প্রথমে তারাময়ীকে বলল দেবদত্ত।

যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া খেয়ে তারাময়ী দেবদত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি—কি বললি ?

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে আবার বলল দেবদত্ত, আজ তপনকে বিয়ে করেছে সতী। তোমরা দুঃখ পাবে বলে ও তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারে নি, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যেন একটা তুচ্ছ বিষয় আলোচনা করছে এমন ভাবে দেবদত্ত বলল, আজকাল তো অনেকেই এ রকম করে, ও হাসল ভালই তো হল, তোমাদের কোন হাংগামা হল না—

কিন্তু ছেলের কথা বোধহয় তারাময়ীর কানে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। সমস্ত শরীর টলছে।

পাড়ায় কেমন করে মুখ দেখাবেন তিনি। লোকে জিজ্ঞেস করলে কেমন করে বলবেন তাঁদের একমাত্র মেয়ে অসবর্ণ বিয়ে করেছে।

ভবতোষ বাবু ঠিক কথাই বলতেন, বংশের নাম ডোবাবে এ মেয়ে।

শেষ অবধি তাই করল সতী।

নিষ্ঠুর স্বার্থপর নির্লজ্জ মেয়ে!

তারাময়ী মুখ দেখবেন না আর ওর।

স্ত্রীর মুখ থেকে সব কথা শুনলেন ভবতোষ বাবু।

দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ক্রোধে মুখ লাল হয়ে গেল তাঁর। যদিও সতী তাঁকে বহুবার ইংগিত দিয়েছিল এবং এ ব্যাপার একেবারে অজ্ঞাত ছিল না তবু মুখ দেখে মনে হল, এ বংশে এমনি ঘটনা ঘটবে তা যেন তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

কম্পিত স্বরে স্ত্রীকে ভবতোষ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে খবর দিল কে ?

দেবু।

সে কোথা থেকে জানল ?

ওই তো বিয়ে দিয়েছে।

কি ?

ও গিয়েছিল বিয়ে বাড়িতে—

থাম! বোধহয় সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ভবতোষ বাবু, বিয়ে বাড়ি! কী বলছ তুমি! কুল ছেড়ে কেউ বিয়ে বাড়িতে যায় না। যেখানে যায় তাকে বিয়ে বাড়ি বলে না। যে কুল ছেড়ে যায় তাকে বলে কুলটা। তোমার মেয়ে কুলটা। আর কোন দিন ওর নাম উচ্চারণ কর না। আজ ওর বিয়ের দিন নয়, আজ ওর ওর মৃত্যুর দিন। ও মেয়ে মরে গেছে। ব্যস্—

অনেক দিন পর ভবতোষ বাবু দেবদত্তর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বললেন, তুমি যে ফিরে এলে ?

আমি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। ঘৃণ্য অন্যায় কাজ করে আমার বাড়িতে বসে সাফাই গাইতে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগছে না তোমার ?

দেবদত্ত মাথা তুলে ভবতোষ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কোন ঘৃণ্য অন্যায় কাজ আমি করিনি।

তোমার যুক্তি আমি মানব না। অপদার্থ সন্তান তুমি। সংসারের কোন উপকার হয় না তোমাকে দিয়ে। তা না হোক, কিন্তু বংশে কলঙ্ক দেবার কোন অধিকার তোমার নেই। বিয়ে বন্ধ করে ওকে বাড়ি টেনে এনে তালা চাবি দিয়ে আটকে রাখতে পারলে না ?

দেবদত্ত বলল, না। অমন করে আজকাল কাউকে বন্দী করে রাখা যায় না। তাহলে ও তালা ভেঙে এক সময় পালিয়ে যেত—

গলা টিপে খুন করতে পারলে না ?

দেবদত্ত বলল, ও সুখী হবে বাবা !

কি বোঝ তুমি সুখের ? কুলে কালি ছিটিয়ে আজ অবধি কেউ সুখী হয়েছে ? বংশের সুনামের চেয়ে স্বার্থ যে বড় করে দেখে পূর্ব পুরুষেরা তাকে কখনও ক্ষমা করেন না—ক্ষমা করতে পারেন না।

ভবতোষ বাবুর কথা শুনে চুপ করে রইল দেবদত্ত। এই অবস্থায় বাবার সংগে তর্ক করা সমীচীন মনে করল না। এখন তাঁর মাথার ঠিক নেই।

কঁথা বলছ না যে ?

কি বলব ?

বিয়ে বন্ধ করলে না কেন ? আমি বেঁচে থাকতে কে তোমাকে ওর বিয়ে দেবার অধিকার দিল ?

দেবদত্ত বলল, ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে সতীর—

কানে আঙুল দিয়ে ভবতোষ বাবু বললেন আমার সামনে ওই কুলটার নাম উচ্চারণ করবে না তুমি !

কী বলছেন ! ভদ্রলোকের ছেলেকে ভদ্র ভাবে সতী বিয়ে করেছে। আমিও তপনকে অনেক দিন থেকে জানি বলেই ওদের বিয়ে দিয়েছি—

তাহলে তুমিও গিয়ে থাক সেখানে। কে তোমাকে বলেছে আমার বাড়িতে ফিরে এসে তোমাদের পাপের দায় আমার ঘাড়ে চাপাতে ?

পাপ পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে না।

সে সব কথা রাস্তায় গিয়ে বল। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। তোমাদের মুখ দেখাও পাপ। কুলাঙ্গার !, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবার ক্ষমতা নেই, শুধু নাম ডোবাতে পার—

আপনি কি সত্যি আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এত বড় অন্যায় করে আমার বাড়িতে বসে গান গেয়ে

দিন কাটাবার তোমার আর কোন অধিকার থাকতে পারে না সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধিও কি তোমার নেই ?

দেবদত্ত কথা বলল না।

আর কোনদিনও ফিরে এস না। কোন কারণেই নয়। তোমার বোনকেও সেকথা জানিয়ে দিও। আমার সব সন্তান মরে গেছে। ভূত-প্রেতের মতো আমার সামনে এসে তারা যেন কোনদিন আমাকে আরও আঘাত দেবার চেষ্টা না করে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তারাময়ী কাঁপছিলেন। শীতে না ক্রোধে না আশঙ্কায় তা হয় তো তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

নিজের ব্যবহারের দুএকটা জিনিশপত্র আর তানপুরাটা হাতে নিয়ে দেবদত্ত বেরিয়ে পড়ল। এরপর আর এ বাড়িতে থাকা যায় না।

নিরাশ্রয় হয়ে রাস্তায় নেমে বিচলিত হয়ে পড়ছে না দেবদত্ত, বরং আজ থেকে তার বাস করবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই বলে ভাল লাগছে। অদ্ভুত আনন্দে হালকা মনে হচ্ছে দেহমন।

কোথায় রাত কাটাবে, কি খাবে, দেবদত্তকেও সে-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু এখনও সে ঠিক করতে পারে নি প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠবে।

ঘটনাটা যেন হঠাৎ ঘটে গেল !

আস্তে আস্তে দেবদত্ত হাঁটতে লাগল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার একেবারে পাশে একটা মোটর গাড়ি ব্রেক করল। কিন্তু দেবদত্ত তো সতর্ক হয়েই পথ চলেছে। চাপা পড়বার কোনই' সম্ভাবনা ছিল না তার। কাজেই মোটর গাড়ির এমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়বার কারণ কি !

দেবদত্ত মাথা তুলে তাকাতেই সুনন্দা গাড়ি থেকে নেমে তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কাল বাড়ি ছিলেন না, আজও

বেরিয়ে পড়েছেন—আপনি কি মনে করেন আমার সময়ের কোন দাম নেই?

সুনন্দার কথা বলবার ধরন দেখে দেবদত্ত প্রথমে হাসল। তারপর আঙুল দেখিয়ে ইসারায় তাকে থামতে বলে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলে দেখতে দেখতে ভিড় জমে যাবে, আপনার গাড়িতে উঠতে পারি কি?

উঠুন।

দেবদত্ত হেসে বলল, ধন্যবাদ!

তবু গাম্ভীর্য গেল না সুনন্দার। মোটরে দেবদত্তর পাশে বসে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করতে চান? আপনার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে আমাকে গান শেখাবার ইচ্ছে নেই আপনার?

কে বলল? আমি জোর করে আপনাকে গান শিখতে রাজি করালাম আর এখন আমার ইচ্ছে থাকবে না কেন?

তা হলে এখন যাচ্ছেন কোথায়?

কোন ঠিক নেই।

রসিকতা করছেন?

মোটেই নয়। সত্যি কথাটা আপনাকে শুধু জানালাম।

দয়া করে একটু আগে টেলিফোন করে জানালেই তো পারতেন, তাহলে আমাকে শুধু শুধু এতদূর কষ্ট করে আসতে হত না।

যদি আমার এমন অবস্থা আগে হত তাহলে নিশ্চয়ই টেলিফোন করে জানাতাম। আপনাকে কষ্ট করতে হত না।

সুনন্দা একটু হাসল, কি অবস্থা হয়েছে আপনার?

মাথা রাখবার আর ঠাঁই নেই বলতে পারেন।

মানে?

দেবদত্ত আঙুল দেখিয়ে বলল, আজ থেকে ও বাড়িতে আমার

প্রবেশ নিষেধ। দেখছেন না হাতে জিনিশপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি?

অবাক হয়ে সুনন্দা বলল, কিন্তু কেন?

সংক্ষেপে সতীর বিয়ের কাহিনী সুনন্দাকে শোনাল দেবদত্ত, যেহেতু আমি তাকে সমর্থন করেছি সেই হেতু আমিও অপরাধী এবং শাস্তি আমাকেও পেতে হবে—

কিন্তু আপনার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না সামান্য শাস্তি আপনি পেয়েছেন?

গাড়িতে এমন আরামে বসে থাকলে মুখে তো কোন রেখা পড়বার কথা নয়—

সুনন্দা বলল, সে আর কতটুকু সময়ের জন্যে। কিন্তু তারপর কোথায় যাবেন?

তা জানি না।

এখন চলেছেন কোথায়?

বললাম তো আমার গন্তব্য স্থানের! আপাতত কোন ঠিক নেই।

একটু বিব্রত হয়ে সুনন্দা বলল, কিন্তু এখানে তো আর সারা রাত গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না—

তা যায় না বটে, তানপুরায় আস্তে ঝঙ্কার তুলে দেবদত্ত বলল, আপনার কোন কাজ আছে নাকি এখন?

না, আপনি এখানেই গানের পাঠ দেবেন নাকি? একটু থেমে সুনন্দা বলল, তার চেয়ে আমাদের বাড়ি গেলেই তো ভাল হয়?

তা হয়! মাইনে কাটবার যা ভয় দেখিয়ে গেছেন কাল, দেবদত্ত হেসে বলল, কিন্তু লটবহর নিয়ে এই অবস্থায় আপনাদের বাড়ি ঢোকবার সাহস নেই। আর তা ছাড়া আজ রাত্তিরের জন্যে একটা আস্তানার ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি হয় করা দরকার।

কোথায় থাকিবেন ঠিক করেছেন ?

ঠিক করবার সময় পেলাম কখন !

কোন আত্মীয়র বাড়ি চলে যান।

তেমন কেউ নেই আমার।

একটু ভেবে সুনন্দা বলল, তবে তো মুশকিল। সন্ধ্যে হয়ে এল !

সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে দেবদত্ত বলল, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় তাহলে চলুন একটু ঘুরে বেড়াই ? মাথায় হাওয়া লাগলে আশাকরি একটা উপায় বের করতে পারব।

ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বলে সুনন্দা বলল, চলুন। আমার কোন অসুবিধা হবে না।

টালিগঞ্জ ফাঁড়ি ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চলতে লাগল। এ রাস্তায় ড্রাইভারকে সতর্ক থাকতে হয়। পথ বিশেষ প্রশস্ত নয়। কিন্তু মিনিটে মিনিটে গাড়ি আসে, বাস যায়, ট্রাম ঘণ্টা দেয়। তা ছাড়া নানা ধরনের লোকের ভিড় তো আছেই। একটু অসাবধান হলেই দুর্ঘটনা ঘটে।

চারু মার্কেটের কাছাকাছি আরও বেশি ভিড়। তবে আর একটু এগিয়ে যেতে পারলেই গাড়ির গতি বাড়ান যায়। সামনেই পোল। ওটা পেরিয়ে গেলে ফাঁকা রাস্তায় পড়া যায়। কিন্তু ওই পোলের তলা দিয়ে যেতে প্রাণ বেরিয়ে যায় ড্রাইভারের।

বর্ষাকালে অসুবিধা চরমে ওঠে। পোলের তলায় এত জল জমে যে যানবাহনের চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু রিক্সওয়ালারা ভরসা। মোটা ভাড়ায় তারা ওইটুকু পথ পার করে না দিলে টালিগঞ্জের বাসিন্দাদের বাড়ি ফিরে আসতে হয় কিংবা চারু অ্যাভিনিউএর মধ্যে দিয়ে অনেক ঘুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের ওপর পড়তে হয়।

তাছাড়া ওই পোলের তলায় কোন না কোন অঘটন প্রায়ই ঘটে।

আর তখন পর পর অনেক ট্রাম দাঁড়িয়ে থাকে। বাস এগিয়ে যেতে পারে না বলে ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে পথ করবার চেষ্টা করে। রিক্সা গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি সাইকেল লরি সারা রাস্তার এমন অবস্থা করে তোলে যে এ পাড়ার মানুষ সেদিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে ভাবে কবে টালিগঞ্জের পাট উঠিয়ে পোলের ওপারে গিয়ে বাস করবার সৌভাগ্য হবে তার।

যাহাকে সুনন্দার গাড়ি বিনা বাধায় পোলের তলা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই ড্রাইভার জানতে চাইল এবার কোনদিকে যেতে হবে।

দেবদত্তকে কিছু না জিজ্ঞেস করে সুনন্দা লেক ঘুরে যাবার নির্দেশ দিল তাকে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। আসন্ন ফাল্গুনের হাওয়া মাঝে মাঝে বইলেও এদিকটায় এখনও বেশ শীত।

লেকের জলের ওপর কুয়াশা জমেছে। এপাশে ওপাশে দু একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেঞ্চের ওপর বসে কথা বলছে ছেলে মেয়ে।

সুনন্দা জিজ্ঞেস করল, কিছু ঠিক করলেন?

কিসের?

আপনার থাকবার।

না, ঠিক করতে পারছি না, অল্প হেসে দেবদত্ত বলল, এমন অবস্থায় যে পড়তে হবে সেকথা আগে ভাবতে পারিনি বলেই মুশকিল হচ্ছে।

কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে, একটা ব্যবস্থা আর দেরি না করে এখুনি করে ফেলা দরকার!

আপনি ব্যস্ত হবেন না। একটা কিছু নিশ্চয়ই ঠিক করে ফেলব।

কখন আর করবেন?

সুনন্দার উদ্বেগ লক্ষ করে খুশি হল দেবদত্ত। এ অবস্থায় না পড়লে তার এই পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যেত দেবদত্তর কাছে:

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতেই সুনন্দার সংগে দেখা হয়ে গেল বলে দেবদত্ত এক মুহূর্তও বিমর্ষ হয়ে থাকবার অবসর পেলনা। যদি সুনন্দা তার পাশে বসে না থাকত তাহলে হয় তো সতীর কথা ভেবে আর মা-বাবার কথা মনে করে কিছুক্ষণের জন্যে ভাবপ্রবণ হয়ে উঠত সে।

ড্রাইভার এক পাক ঘুরতেই দেবদত্ত বলল, আর নয়। শুধু শুধু আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার ফেরা যাক।

কিন্তু ফিরবেন কোথায়?

যতীন দাস রোডে অনিলের বাড়িতে আমাকে নামিয়ে দিন।

তাঁর বাবার অসুখ শুনেছি। অসুবিধা হবে না?

বোধ হয় না। দেখি তো। দু একদিনে কি আর এমন অসুবিধা হবে!

অনিলের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুনন্দা বলল, দেখুন কি হয়। আমি অপেক্ষা করছি।

দেবদত্ত বলল, অনেক সময় নষ্ট করলেন আমার জন্যে। আর দেরি করবেন না—

একটু বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে সুনন্দা বলল, দয়া করে ভেতরে গিয়ে খবর নিন। এই ভাবে আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যেতে পারি না সেকথা বোঝেন না কেন!

কথা না বাড়িয়ে দেবদত্ত ভেতরে গেল।

অনিল বাড়ি নেই। সরোজ বাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গেছে।

অনিলের পিসিমার সংগে কথা বলে দেবদত্ত কয়েক দিন সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করল।

পিসিমা তাকে ভাল করে চেনেন। কাজেই তার আগমনে খুশি

হয়ে বললেন, ভগবান যেন তাকে পাঠালেন। তার মতো বন্ধু এ সময় কাছে থাকলে অনিল মনে অনেক জোর পাবে। ছুটোছুটি করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল ছেলেটার।

তখন দেবদত্ত স্বনন্দার মোটর গাড়ির কাছে ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, আপাতত একটা গতি হল। আমি দু-একদিন এইখানেই থাকব।

স্বনন্দা শান্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে আমি কি আগামী শনিবার গান শিখতে এখানে আসব?

না না। অতদিন নিশ্চয়ই আমি এখানে থাকব না। একটা ফ্ল্যাট খুঁজে নেব তার আগেই।

তাহলে?

একটু ভেবে দেবদত্ত বলল, এভাবে আপনি সময় নষ্ট করছেন এটা আমার ভাল লাগছে না। আমিই বরং আগামী শনিবার থেকে আপনাদের বাড়িতে যাব।

তাই যাবেন। যা-ই ঘটুক না কেন আমি ঠিক বাড়ি থাকব, অনাবশ্যক জোর দিয়ে কথা শেষ করল স্বনন্দা।

দেবদত্ত ইংগিত বুঝতে পেরে হেসে বলল, আপনি এখনও ভুলতে পারেন নি দেখছি, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আবার বলল, অমন অভদ্রের মতো ব্যবহার আমি কখনও কারুর সংগে করি না। সেদিন কী যে হয়েছিল আমার!

আপনার কিছু হয় নি। একদিনও বাড়ি না থেকে আমিই আপনার সংগে চরম অভদ্রতা করেছিলাম—

বাধা দিয়ে দেবদত্ত বলল, কিন্তু তারপর অক্ষরে অক্ষরে সাংঘাতিক ভাবে কথা ঠিক রেখে আপনি তো প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেন, সে হাসল, আর আমি কি করব বলতে পারেন?

সুনন্দা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, এর মধ্যে নতুন বাড়িতে উঠে গেলে দয়া করে আমাকে টেলিফোনে জানাবেন।

দেবদত্ত মাথা নাড়ল।

তার সংগে কথা শেষ করে বাড়ি ফেরবার সময় সুনন্দার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। যদিও দেবদত্তর কি হবে না হবে, সে কোথায় থাকবে তা সুনন্দার ভাববার কথা নয়। তবু একজন পরিচিত মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে জিনিশপত্র ঘাড়ে করে রাস্তায় ঘুরছে সে দৃশ্য দেখার অভ্যেস নেই তার।

এখন দেবদত্ত একটা থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারলে সুনন্দা যেন নিশ্চিন্ত হয়।

কেন তার এই ভাবনা কে জানে!

অনিল আর অমিতার চেষ্টায় দেবদত্ত দিন দু-একের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেল।

ঠিক ফ্ল্যাট অবশ্য বলা চলে না। সাদার্ন অ্যাভিনিউএ খুব ছোট ছোট দুটো ঘর। ভাড়া কিন্তু রীতিমতো বেশি।

বেশি ভাড়া না দিলে যখন বাড়িওলা থাকতে দেবেনা তখন ওই টাকা দিতে রাজি হতেই হল দেবদত্তকে। পরে না হয় ছেড়ে দিলেই চলবে। এখন তো গিয়ে দেখা যাক সে চালাতে পারে কিনা।

চালান কঠিন বৈকি। ছাত্র-ছাত্রী খুব বেশি নেই দেবদত্তর এখন। তবু শুধু সরদ দিয়ে গান গেয়ে যেতে পারলে বোধহয় কোন অভাব থাকবেনা তার।

দেবদত্তর একা একা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকার ব্যাপারে অমিতা কিন্তু সায় দিতে পারে নি। ঘর খালি পড়ে রয়েছে তাদের

বাড়িতে। দেবদত্ত ইচ্ছে করলে অনায়াসেই সেখানে থাকতে পারে। শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ কি!

কিন্তু কিছুদিন কষ্ট করতেই চায় দেবদত্ত। তার ক্ষমতার আর সহ্য-শক্তির একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার। সে নিজেই নিজের সংগে বোঝাপড়া করে জেনে নিতে চায় সব অবস্থাতে সে খাড়া থাকতে পারবে কিনা।

গুছিয়ে বসতে খুব বেশি সময় লাগল না দেবদত্তর। বড় রাস্তার ওপর ফার্নিচারের দোকান থেকে ভাড়া করে সে খাট আর গোটা কয়েক চেয়ার নিয়ে এল।

আর যা টাকা ছিল তার কাছে তা দিয়ে সংসারের নিতান্ত দরকারী টুকি টাকি জিনিশ কিনে ফেলল। অমিতা একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিয়েছে। নিজে এসে তাকে বলে দিয়ে গেছে সে কোথায় কি রাখবে, কি কি কাজ করবে।

ব্যস আর ভাবনা কি দেবদত্তর। শুধু প্রয়োজন মতো প্রতিদিনের খরচ মেটাতে পারলে হয়। না যদি পারে তাহলে নিখিলের কলোনিতে গিয়ে বাস করবে।

দেবদত্ত তার নতুন ঠিকানা জানিয়ে সুনন্দাকে টেলিফোন করল। সব খবর দিয়ে সতীকে চিঠি লিখল। তপনকে নিয়ে একদিন দেখে যেতে বলল তার সংসার।

বিকেল বেলা তপনের সংগে সতী এসে হাজির হল। দেবদত্ত তখন চাকরকে উনুন ধরাতে বলে চায়ের অপেক্ষা করছে।

সতী দেবদত্তকে প্রণাম করে চোখে জল নিয়ে বলল, আমার জন্যে তোমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে দাদা—

কষ্ট আবার কি? আমাকে কি কিছু খারাপ দেখছিস?

ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে সতী বলল, কেমন করে পারবে তুমি—এক গ্লাশ জলও যে নিজে গড়িয়ে খেতে পার না—

তুই তো আমাকে খুব কাজের লোক মনে করিস দেখছি, সতীর একটা হাত ধরে দেবদত্ত বলল, দরকার হলে সকলেই সব করতে পারে রে। দেখছিস না আমি তো দিব্যি আছি।

সতী তবু কাঁদে।

ছি ছি, করিস কি সতী? নতুন বিয়ের পর দাদার বাড়িতে প্রথমবার এসে এমন করে কাঁদতে নেই।

না কেঁদে করব কি দাদা, চোখের জল মুছে সতী বলল, মা বাবাকে দুঃখ দিলাম, তোমাকে ঘর ছাড়া করলাম—আমি কেমন করে সব কথা ভুলে সুখী হব!

দেবদত্ত হাসল, তোর মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি। পাগলের মতো আবোল তাবোল কি সব বকছিস, তপনের দিকে একবার তাকিয়ে দেবদত্ত বলল, দম্ভে আঘাত লাগলে সব মানুষের মন জলে যায়। বুঝিস তো যত দম্ভ তত যন্ত্রণা। তবু দম্ভের আয়ু বেশিদিন নয়। মা-বাবা একদিন তোকে ক্ষমা করবেন।

না দাদা। বোধহয় ওঁরা কিছুতেই তা করতে পারবেন না। তুমি জান বাবা জোর করে বদলী নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছেন?

জানিনা তো! বলিস কি?

হ্যাঁ, এ বাড়ি ওরা ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু গেলেন কোথায়?

আবার সতীর চোখে জল জমে উঠল, এলাহাবাদ। বন্ধুদের বলে গেছেন ছেলেমেয়ের মুখ আর দেখতে চান না বলে দেশত্যাগী হলেন।

দেবদত্ত বলল, ওঁদের মনে আঘাত লাগা খুব স্বাভাবিক। তুই

কাঁদিস না সতী, জ্বালা বুকে নিয়ে কদিন বেঁচে থাকে মানুষ? জ্বালা একদিন জুড়িয়ে যায়।

তপন বলল, দেবুদা আপনি চলুন আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন।

দেবদত্ত জোরে হেসে বলল, লোকে বলবে কি তপন? সতীর মতো তোমারও মাথা খারাপ হল নাকি?

কেউ কিছু বলবে না দাদা। তাই তুমি চল।

যাক জানা রইল। দরকার হলেই গিয়ে উঠব একদিন তোদের ওখানে।

বাচ্চা চাকরটাকে দোকানে পাঠিয়ে তপন আর সতীর জন্যে অনেক খাবার আনাল দেবদত্ত। সতীর মনের অবস্থা বুঝতে দেরি হয় না তার। তাকে বিয়ে করে কি অপরাধ করেছে তপন যে শ্বশুর বাড়ি থেকে এতটুকু সমাদর পাবে না! সকলের অসুবিধা যেন সতীর জন্যেই।

তাই সব কিছু ভুলিয়ে দেবদত্ত চাইল সতীর মনে আনন্দের বান ডাকিয়ে দিতে। সংস্কারের নানা ঢেউ নানা দিক থেকে আঘাত করে করে সুখী হতে দিচ্ছে না তাকে। এক মুহূর্তে সে-বিপুল তরঙ্গমালা ঠেকিয়ে রাখা দেবদত্তর সাধ্য নয়, তবু অল্প অল্প করে আস্তে আস্তেই তো সব কিছু জয় করে নেবার ক্ষমতা হয় মানুষের।

সতীর হবে না কেন!

বাঁশধানির খোলা মাঠের জলসায় দেবদত্ত অনিল নীলা আর অমিতা যে গান গেয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক জায়গায়। সংগীত সম্মেলনের কর্তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওই গানগুলি শোনবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে বহু লোক।

সকালবেলা রেকর্ড কোম্পানি থেকে লোক এসেছিল দেবদত্তর বাড়িতে। সমস্ত গানগুলি চার খণ্ডে ওরা রেকর্ড করতে চায়। এবং যেহেতু ওদের ধারণা সেগুলি খুব চলবে বাজারে সেই হেতু ওরা ভালই টাকা দেবে শিল্পীদের। এখন দেবদত্তর দল রাজি হবে কিনা আর রাজি হলে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হবে সেইসব কথা জেনে হিসেব-নিকেশ করতে এসেছে রেকর্ড কোম্পানির লোক।

রাজি হবে না কেন দেবদত্ত! তবে অনিল অমিতা আর নীলার সংগে একবার কথা বলা দরকার। সব ব্যবস্থা করে সে চিঠি লিখবে রেকর্ড কোম্পানিতে।

সেই লোক চলে যাবার পর দেবদত্ত বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মন ভরে উঠেছে ওর। কে বলে সাধনার মূল্য পাওয়া যায় না। সার্থক সৃষ্টি করতে পারলে সব দেশের সব লোক শ্রদ্ধার সংগেই তা গ্রহণ করে নেয়।

সব চেয়ে আগে অনিলকে খবর দেয়া দরকার। তার লেখা গান। তারই কথায় গাওয়া হয়েছে খোলা মাঠে অসংখ গৃহ হারা মানুষের সামনে। তারই পুরস্কার জনসাধারণের এই স্বীকৃতি।

দেবদত্ত বেরুতে যাবে এমন সময় সুনন্দার গাড়ি এসে দাঁড়াল তার বাড়ির সামনে। ড্রাইভারকে আর নম্বর খুঁজতে হল না। দেবদত্তকে দেখতে পেয়ে সুনন্দা গাড়ি থেকে নেমে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

বেরুচ্ছিলেন নাকি? খবর না দিয়ে এসে হয় তো আপনকে বিরক্ত করলাম—

একটুও না, দেবদত্ত হেসে বলল, এমন কিছু দরকার নেই আমার। পরে বেরুলেও চলবে। আসুন।

সুনন্দা রসিকতা করে বলল, আপনার সংসার দেখতে এলাম।

তাহলে তো বড় মুশকিল। বিশেষ কিছুই দেখাতে পারব না আপনাকে—

বাঃ, এর মধ্যে তো বেশ গুছিয়ে ফেলেছেন। একটা চাকরও পেয়ে গেছেন দেখছি।

দেবদত্ত হেসে বলল, অমিতা ঠিক করে দিয়েছে।

এখানে আর কেউ নেই বলে স্বচ্ছন্দ গতিতে এঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতে সঙ্কোচ হল না সুনন্দার। তার বেশ মজা লাগতে লাগল। একজন অনভিজ্ঞ পুরুষ বলে করুণা হল দেবদত্তর ওপর।

সে জিজ্ঞেস করল, কোন অসুবিধা হচ্ছে না আপনার?

তেমন কিছু নয়।

ওইটুকু চাকর সব কাজ করতে পারে?

প্রমাণ চান? দেবদত্ত তাকে ডেকে তাড়াতাড়ি দু কাপ চা করে আনতে বলল।

তারপর সুনন্দাকে জিজ্ঞেস করল, আমার সংসার কেমন দেখলেন বলুন?

মন্দ কি, সুনন্দা হাসল, তবে দু একটা সাংঘাতিক ত্রুটি আছে। আমার মনে হয় অবিলম্বে সেগুলি সংশোধন করা দরকার।

দেবদত্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, কি ত্রুটি বলুন?

ঘরে পর্দা টাঙান দরকার, টেবিলে চাদর পাতা দরকার—

দেবদত্ত বাধা দিয়ে বলল, সংশোধন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সুনন্দা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এমন আরও অনেক ত্রুটি বেরিয়ে পড়বে কিন্তু সেগুলি তো আপনার মতো মানুষের পক্ষে সংশোধন করা সম্ভব নয় তার চেয়ে আমার মনে হয়—

কি বলুন?

বাড়ি ফিরে গেলেই তো পারেন। শুধু শুধু অসুবিধা ভোগ করে লাভ কি?

আমি তো ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি নি। আমাকে থাকতে দেয়া হয় নি সেখানে।

তবু মিটমাট করে নিলেই তো হয়।

না, তা হয় না।

যদি অনধিকার চর্চা করে থাকি তাহলে ক্ষমা করবেন। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এমন করে উপদেশ দেয়া হয়তো আমার উচিত নয়—

কেন নয়? সুনন্দার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেবদত্ত বলল, সেটাই তো আমার লাভ। মানুষ একদিকে হারায়, অন্য দিকে পায়।

কিন্তু আপনি কি পেলেন?

আপনার সমবেদনা!

তা না পেলেও আপনার কোন ক্ষতি ছিল না। আপনার তো বন্ধুর অভাব নেই।

আপনার মতো বন্ধুর অভাব ছিল। আমি যদি রাজঐশ্বর্য পেয়ে বিপুল সুখের মাঝে বাস করতাম তাহলে সমবেদনার এই সুর কিছুতেই আপনার মনে বেজে উঠত না।

আমার মনের সুর নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? না-ই বা বাজল আমার মনে কোন সুর—রাজঐশ্বর্য পেয়ে সুখী হলে আপনার তো অনেক বেশি লাভ হত!

না, হত না। মানুষের জন্যে মানুষের মনে সমবেদনার সুর বাজান আমার কাজ কি না। সেটাই আমার চরম সুখ। জীবনের সংগে মিটমাট করে ঐশ্বর্য লাভ করলে আমার সুখ হত না।

দু হাতে চায়ের দুটো ভরা কাপ নিয়ে চাকর এসে ঢুকল ঘরে। ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল দেবদত্তর দিকে। আর একবার সুনন্দার দিকে। তারপর খুব সাবধানে কাপ দুটো রাখল টেবিলের ওপর।

আর তখন হঠাৎ দুরন্ত হাওয়া ছুটে এল ঘরে।

ফাল্গুনের প্রথম দিন বোধ হয়।

লেখা রয়েছে, অপারেশন থিয়েটার।

তার নিচে লাল অক্ষর জ্বলজ্বল করছে, অপারেশন অন্!

যথাসময় দু হাজার টাকা অনিলের হাতে তুলে দিয়ে তার বাবাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল অমিতা। কলকাতার কোন প্রসিদ্ধ হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডাক্তার আজ অস্ত্রোপচার করছে সরোজনাথের।

সোজা ব্যাপার নয়। ডাক্তার অভিজ্ঞ হলেও কোন আশা দিতে পারে নি। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে সব। ঠিক দুপুর বারোটা থেকে অপারেশন আরম্ভ হয়েছে। প্রায় ঘণ্টা ছয়েক লাগবে।

ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় নি কাউকে। বাইরে অপেক্ষা করছে দেবদত্ত অনিল আর অমিতা। উত্তেজনায় প্রহর গুণছে প্রত্যেকে। কারুর মুখে কথা নেই।

অমিতার মুখ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে। বড় করুণ। অস্ত্রোপচারের লাল অক্ষর জ্বলা ঘরের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কায় দুলে উঠছে ওর মন। অনিলের মা নেই। ওর বাবা যেন বেঁচে থাকেন। আজকের এই অস্ত্রোপচার যেন সফল হয়!

মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে অনিল বসেছিল। কি হবে কে জানে। ও যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে! কিছু

বোঝা যাচ্ছে না। কোন শব্দ আসছে না ঘর থেকে। তবু গায়ে যেন হিমশীতল স্পর্শ এসে লাগছে।

মাথা নিচু করে আছে অনিল লজ্জায়। এতদিন সে যা করেছে আর ভবিষ্যতে যা করবে বলে ঠিক করেছে—সব কিছুই মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে তার। একেবারে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। শুধু ছেলেমানুষী করে সে সময় নষ্ট করেছে এতদিন। নিজে মূর্খ বলে অর্থ যশ কোনটাই লাভ করতে পারে নি।

হয় তো অমিতার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে হয়েছে বলে এত কথা মনে হচ্ছে অনিলের। বাপের চিকিৎসার জন্যে এমন করে পরের কাছ থেকে ভিক্ষে করবার কথা নয় তার। ইচ্ছে করে সম্পদ পায়ে মাড়িয়ে সে এমন ভিখিরীর মতো দিন কাটাচ্ছে। কোন মানে হয় না এই নির্লজ্জ দারিদ্র্যের!

বিরাট বিরাট সংগীত প্রতিষ্ঠান থেকে, বম্বের আর কলকাতার সিনেমা কোম্পানি থেকে অসংখ্যবার কত লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে তার কাছে! কিন্তু কিছু না ভেবে, আত্মসম্মানের কথাও মনে না করে নির্মম প্রত্যাখান করেছে সে।

কি দরকার ছিল লক্ষ্মীকে অমন করে ফিরিয়ে দেবার? কি দরকার ছিল নিজের উপার্জন করবার ক্ষমতা থাকতেও পরের কাছে দীনের মতো হাত পাতবার? অনিল ভুলতে পারছে না দৈন্যের এই লজ্জার কথা।

দু একবার অনিল লোভনীয় আহ্বানে সাড়া দিতে পারত। চিরকাল তাকে যে তা করতে হবে এমন কোন কথা নেই। শুধু কিছু টাকা করে আবার সে নিজের কাজ করতে পারত। তাহলে একেবারে শুরু থেকে হয় তো সরোজনাথের চিকিৎসার আয়োজন ভাল ভাবেই হত!

আনন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতা কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল অনিলের ব্যক্তিত্বের কথা। তার দৃঢ় চিত্তের কথা। সব প্রলোভন জয় করবার অসামান্য ক্ষমতার কথা।

অমিতা অবাক হয়ে লক্ষ করেছে দেশসুদ্ধ লোক যতই প্রশংসা করুক, গান শোনবার জন্যে ব্যাকুল হোক তবু কোন সার্বজনীন সংগীত সম্মেলনে তাদের খুশি মতো গান গাইতে দেয়া হয় না। তাদের আমন্ত্রণ জানান হয় না।

যেন তারা খুশি মতো গান গাইলে শ্রোতারা দুই হাত দিয়ে কান চেপে বসে থাকবে। একটি লোকও শুনবে না তাদের গান।

অমিতা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না কি তাদের অপরাধ। কেন তাদের সংগে এই অসহযোগ। অন্যান্য সংগীত প্রতিষ্ঠান-গুলিও তাদের এড়িয়ে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

তারা কি শিল্পী নয়?

ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে চাইলে প্রাচীন কালেও খুশি মতো গান না গেয়ে অপরের তালে তাল মেলাতে হত গায়কদের।

সিংহাসনে রাজা বসে আছেন। রাজা কিন্তু বিমর্ষ। ধরে আন সভা গায়ককে। গাও বিরহের গান। রাজার হুকুম! গাইতেই হবে ফরমায়েশ মতো গান।

কিংবা রাজা যুদ্ধ জয় করে এসেছেন। আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে রাজ্যে। যদিও এ জয়কে জয় বলে মনে করতে পারছে না গায়ক। তার মনে শান্তি না থাকলেও গাইতে হবে আনন্দের গান। রাজার হুকুম তামিল না করলে বেঁচে থাকা দায় হবে তার।

গান শুনে খুশি হলে থলি ভরে মোহর দেবেন রাজা। আর বিরূপ হলে গর্দান যাবে গায়কের। হয় মোহর নাও, নয় প্রাণ দাও।

কত গায়ক নিরুপায় হয়ে যুগ যুগ ধরে সুর বেঁধেছে পরের ইচ্ছেয়। তবু যশ পেয়েছে, অর্থ পেয়েছে, সুখে কাটিয়েছে দিন।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহ যে করে নি তা নয়। তাই ইতিহাসের পাতায় রাজা-মহারাজার নামের পাশে তাদের নাম লেখা নেই। হয় তাদের মাথা কাটা গেছে, নয় না খেতে দিয়ে তিল তিল করে মারবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবু আজকের মানুষ গবেষণা করে সন্ধান পেয়েছে তাদের—তাদের উদ্দেশে রেখেছে প্রণাম।

রাজা আর নেই বটে এখন। তবু অমিতা ভাবে, অন্য রূপে ব্যবস্থা ঠিক তেমনি আছে।

রাজার মতো মানুষরা ডেকে ডেকে আজও বলছে গায়কদের, এস, গান গাও। আমাদের খুশি কর। থলি ভরে মোহর নিয়ে বাড়ি যাও।

অমিতা আরও ভাবে, খুশি না করলে গলা কাটা যাবে না বটে আর এখন, তবে সাধ্য মতো চেষ্টা করা হবে সব দিক দিয়ে গলা টিপে রাখবার।

তবু অনেক গায়কের প্রাণের জোয়ারে বন্ধন কখন শিথিল হয়ে যায়। সব বাধা ডিঙিয়ে সুর ঠিক পৌছয় কান থেকে কানে—মন থেকে মনে।

দিনকাল একটু অন্য রকম কিনা!

আর মানুষগুলোকেও বোকা বানিয়ে রাখা যায় না কিনা!

তাই গায়ক মরে না। বেঁচে থাকে। বাঁচিয়েও রাখে মানুষকে।

রাজার মতো মানুষদের কথা না শুনেও।

অনিলও বেঁচে থাকবে।

দেবদত্ত একমনে লক্ষ করছিল যত না উত্তেজনা জমা হয়েছে অনিলের মুখে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে অমিতার চোখে।

যেন সব দায় তার।

হয়তো এরই নাম শক্তি। এমনি করেই যুগে যুগে একজনের প্রেম মিশে যায় আর একজনের সাধনায়। প্রেম আর সাধনা মিলে হয় শক্তি

তখন কোন বাধাকে আর বাধা বলে মনে হয় না। দুঃখ জয় করবার বিপুল ক্ষমতা জাগে। আর এক অসাধারণ পরিবেশ যেন নিজের অজ্ঞাতেই গড়ে নেয় মানুষ।

পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয় দিনে দিনে। সমাজ আর সভ্যতার রূপও তো পাল্টায়। কিন্তু আপন শক্তি সঞ্চয় করবার রীতিটা বোধ হয় চিরদিন ঠিক একই রকম।

প্রভূত ক্ষমতা থাক একজনের, পরাক্রমের মহিমায় আকাশ ছেয়ে যাক, তবু সে মনে মনে নিতান্ত দুর্বল, যদি না নিজের বীর্যের প্রতিফলন দেখে অন্যের স্থির চোখের তারায়।

একের বিক্রমে নয়, দুইএর সম্মিলনে মানুষ শক্তিমান।

প্রেম একা ফোটে না, আস্তে আস্তে একটু একটু করে অন্যকেও ফোটায়। প্রেমের বিকাশ মানেই শক্তির প্রস্ফুটন।

এ রীতির পরিবর্তন হয় না কোন কালে।

অপারেশন অন্—লাল অক্ষরগুলি কখন নিভে গেছে লক্ষ করে নি ওরা কেউ।

অমিতা দেখল প্রথমে। তারপর ঘড়ি দেখল। পুরো তিন ঘণ্টাও হয় নি যে এখনও। আড়াইটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে সবে। এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শেষ হল ছ ঘণ্টার কঠিন অস্ত্রোপচার!

যদিও ফাল্গুনের হাওয়া তবু হিমস্পর্শ লাগল অমিতার গায়ে।

দরজা খুলে শূন্য চোখে পরাজিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ডাক্তার। পিছনে পিছনে সহকারীর দল।

দরজা খোলাই রইল।

অমিতা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে যাবে কি ব্যাপার এমন সময় নার্স এসে ম্লান হাসল।

কোন কথা বলল না। সে জানে এরা তার মুখ দেখে বুঝে নেবে সরোজনাথ আর ইহলোকে নেই।

অনিলের সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে! কাঁদতে পারছে না সে কিন্তু যত জল এসে জমা হয়েছে তার চোখে। লাল হয়ে গেছে সারা মুখ। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

অমিতা বুঝতে পারছে না অনিল কি করবে—সে নিজে কি করবে। যত আঘাত এসে লাগুক তার বুকে কিন্তু ধৈর্য ধরে বুক বাঁধুক অনিল।

সে শান্ত হোক।

অমন কর না অনিল। শক্ত হও। শান্ত হও। আমি আছি। আমি থাকব। তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব।

কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না অমিতা।

দেবদত্তর চাকর দরজা খোলা রেখে বাজারে গেছে। বাজার থেকে ফিরতে বেশ দেরি করে সে। অন্যান্য দিন সে বেরিয়ে যাবার পর দেবদত্ত দরজা বন্ধ করে দেয়। আজ কিন্তু এখনও তার ঘুম ভাঙে নি। কাল শ্মশান থেকে ফিরতে বেশ দেরি হয়েছে। অনেক রাত অবধি ঘুমও আসে নি।

দরজা খোলা দেখে ডাকাডাকি না করে নিঃশব্দে সুনন্দা বাড়ির মধ্যে

ঢুকে পড়ল। কেউ কোথাও নেই। দেবদত্তর শোবার ঘরে পর্দা ঝুলছে।

খুশির বিদ্যুত আভা ফুটিয়ে গেল সুনন্দার মুখে। হাল্কা সুরে বললেও দেবদত্ত তার কথা মতো পর্দা টাঙাবার ব্যবস্থা করেছে। টেবিলে হয়তো চাদরও পেতেছে।

ব্যাপারটা কিছু নয়। তুচ্ছ, সামান্ত। তবু অনেকক্ষণ ঘরের সেই পর্দাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল সুনন্দা। ছোট করুণ নিশ্বাস ফেলল। কি ভাবল। খট করে পা দিয়ে শব্দ করে নিজের আগমন জানাতে চাইল দেবদত্তকে।

তবু কারুর সাড়া নেই।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেবদত্তর শোবার ঘরের দরজায় পর্দার পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে ঠক ঠক করে আস্তে আঘাত করল সুনন্দা।

সে-শব্দ শুনে ঘুম জড়ান স্বরে দেবদত্ত বলল, ভেতরে এস।

হাসি মুখে সুনন্দা ঘরের ভেতর ঢুকল। দেবদত্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি কে এসেছে।

দেবদত্তর শোবার ঘরে ঢুকে ইতস্তত করতে লাগল সুনন্দা। ঠিক করতে পারল না সে-ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করবে কিনা।

দেবদত্ত বিছানা ছেড়ে ওঠে নি এখনও। পর্দা সরিয়ে দেয়া হয় নি বলে ঘর বেশ অন্ধকার।

হঠাৎ সুনন্দাকে দেখতে পেয়ে দেবদত্ত তাড়াতাড়ি উঠে বসল বিছানার ওপর, আরে আপনি! আমি ভেবেছিলাম—

আপনার চাকর বোধ হয়, না?

না না—

কিন্তু এখনও শুয়ে আছেন যে? অসুখ বাধিয়েছেন নাকি? ঘড়ি দেখে সুনন্দা বলল, সাড়ে আটটা বাজে প্রায়—

না না, অসুখ নয়, কোন রকমে বিছানা ঠিক করে আলনা থেকে তোয়ালে টেনে নিয়ে দেবদত্ত বলল, একটু বসুন। আমি দু মিনিটের মধ্যে আসছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দেবদত্ত পর্দা সরিয়ে দিয়ে গেল। জানালাটাও খুলে দিল ভাল করে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়ল সুনন্দা। মিষ্টির একটা বাক্স রাখল টেবিলের ওপর। এখন ঘর আলোয় ভরে গেছে।

সুনন্দা ভাবতে লাগল কোন খবর না দিয়ে যখন তখন তার এখানে এমন করে আসা উচিত নয়। হয়তো দেবদত্তর অসুবিধা হয়। সে কি ভাবে কে জানে।

কিন্তু বিনা প্রয়োজনে আজ সকালে সুনন্দা আসে নি। কাল বিকেলে কেন দেবদত্ত তাদের ওখানে যেতে পারে নি সে-কথা সে জানতে এসেছে।

অলকা সুনন্দাকে দেবদত্তর কথা বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন কাল। কেমন গান শেখায় সে, কি কি গান শিখল সুনন্দা—এই সব।

সুনন্দা কৌশলে মার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, আজ থেকে উনি এখানে গান শেখাতে আসবেন।

অলকা বলেছিলেন, সেই ভাল। যেখানে সেখানে তোমার যখন তখন যাওয়া উচিত নয়। হীরেশ সেটা পছন্দ না-ও করতে পারে। আর তা ছাড়া অনেক রকম লোক থাকে কলকাতা শহরে। কার কি মৎলব বলা যায় না।

মার কথা শুনে মনে মনে হেসেছিল সুনন্দা। দেবদত্তর কোন অভিসন্ধি

আছে নাকি। তা না থাকলে তাকে গান শেখাবার জন্যে এত উৎসাহ কেন তার।

মার স্বভাব ভাল করেই জানে সে। ভাগ্যিস তার গান শেখবার আগাগোড়া কাহিনী তিনি জানেন না। যদি জানতেন তাহলে দেবদত্তর ঘরে এমন করে বসে থাকবার সুযোগ সে কিছুতেই পেত না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও দেবদত্ত কাল গিয়ে পৌছল না সুনন্দার বাড়ি। বিরক্ত হয়ে সুনন্দা ভাবল, কেন এমন করছেন উনি। যদি গান শেখাতে না চান তাহলে সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেই তো হয়। এমন করবার কি দরকার।

খাবার সময় অলকা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কই, তোমার গায়ক তো এল না।

অসুখ করেছে বোধ হয়, বলেই সুনন্দার মনে হল কেন মিথ্যা কথা বলছে সে।

সে তো জানে না কেন এল না দেবদত্ত। ভাবুন মা যা খুশি। তাতে তার কি।

আজ সকালে তাই সুনন্দা জানতে এসেছে কি ব্যাপার আর জানিয়ে দিতে এসেছে এমন করলে বাড়িতে মান থাকে না তার।

কারণ ঘটলে কথা ওলোট পালোট হয়ে যায় বটে মানুষের। কৈফিয়ৎ দেয়া হয় তখন। কিন্তু কৈফিয়ৎএর পর কৈফিয়ৎ দিলে কাজ বলে কথাটা মুছে দিতে হয় অভিধান থেকে।

কারণ যা-ই ঘটুক, কাজ বন্ধ করে বার বার কৈফিয়ৎকে মাথা চাড়া দিতে দিলে জগৎ চলবে কেন।

ঝড় ঝঞ্ঝা জন্ম মৃত্যু বন্যা ভূমিকম্প গ্রহ উপগ্রহের স্থান অদল বদল—কত কারণ তো ঘটে প্রতিদিন, কিন্তু তার জন্যে কি প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম পাল্টে যায়!

রবিবার সকালে মনে চাপা ক্রোধ নিয়ে বাড়ি থেকে বার হলেও ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ফাল্গুনের এলোমেলো হাওয়ায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মনটা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে গেল সুনন্দার।

ছুটো ছোট ছোট ঘর। সংসার করবার সব রকম সরঞ্জাম নেই। শুধু চাকরের ওপর নির্ভর করে একজন সহজ মানুষ কাটায় দিন। এমন করে বাস করতে অনভ্যস্ত সে। কত অসুবিধা তার।

তার ওপর কোন আক্কেলে রাগ করে সুনন্দা!

তার ওপর রাগ করে থাকতে ইচ্ছে হয় না।

সুনন্দা ঘুরে দাঁড়ায়। কি কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। পা চালিয়ে রাস্তার ওধারে প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান থেকে দামী সন্দেশের বড় বাক্স কেনে। তারপর আবার এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়ায়।

তাদের ড্রাইভার আসবে না এ বেলা।

অল্পক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে দেবদত্ত ফিরে এল। সন্থ পাট ভাঙা পাঞ্জাবি পরেছে। চুল আঁচড়েছে যত্ন করে। স্নানও সেরে নিল নাকি?

দেবদত্ত বলল, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম!

আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। খবর না দিয়ে এভাবে অসময়ে আমার আসা উচিত নয়।

দেবদত্ত একটা চেয়ার টানতে টানতে বলল, লৌকিকতার বেড়া না ভাঙলে মানুষ সহজ হতে পারে না।

সুনন্দা বলল, কাল আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। মা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

অনিলের বাবা মারা গেলেন কাল—

চমকে উঠে সুনন্দা বলল, সে কি?

সেই কারণেই শেষ অবধি যাওয়া হয়ে উঠল না। আপনাদের

ওখানে যাওয়ার কথা আমি একেবারেই ভুলি নি। কিন্তু শ্মশান থেকে ফিরতে এত দেরি হল—দেখলেন তো কত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিলাম!

অনিলের বাবার অসুখ আর আত্মাপচার সম্বন্ধে দু একটি প্রশ্ন করল সুনন্দা তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সন্দেশের বাক্সটা রয়েছে সামনে টেবিলের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ লজ্জা করতে লাগল সুনন্দার। কেমন করে দেবদত্তকে বলবে যে ওটা সে তারই জন্যে এনেছে।

দেবদত্ত হেসে বলল, ত্রুটিগুলি সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি লক্ষ করেছেন?

সুনন্দা মাথা নিচু করে বলল, হ্যাঁ।

আরও যদি কিছু ত্রুটি থাকে তো বলুন?

সুনন্দা খুব আস্তে বলল, যদি চোখে পড়ে তো বলব। কিন্তু আপনি বসে আছেন কেন? চা-টা খাবেন না?

ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

কেন?

চাকর যতক্ষণ না ফিরে আসে, রসিকতা করে দেবদত্ত বলল, ততক্ষণ আমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করে বসে থাকতে হবে—

সুনন্দা বাধা দিল, তৃষ্ণা জয় করুন। কিন্তু ক্ষুধা জয় করবার দরকার নেই, সন্দেশের বাক্স দেবদত্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে সুনন্দা বলল, এই যে।

জোরে হেসে উঠল দেবদত্ত, সেদিন শুধু চা খাইয়েছিলাম বলে আজ সংগে করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন বুঝি?

কথা শুনে সুনন্দার মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল হঠাৎ। তখুনি ঘর ছেড়ে তার চলে যেতে ইচ্ছে করল। বাক্স সুদ্ধ সন্দেশ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল।

কোন রকমে নিজেকে সংযত করে কেটে কেটে সুনন্দা বলল, নিজের জন্যে আনি নি। ওটা আপনার জন্যেই এনেছি!

শান্ত স্বরে দেবদত্ত বলল, সেকথা কি আমি জানি না?

তাহলে স্থূল রুচির মানুষের মতো ভাষা ব্যবহার করে আমাকে আঘাত দেবার চেষ্টা করেন কেন?

আবার হাসল দেবদত্ত, ঠাট্টা করলাম। আপনিই বা আমার সব কিছু এমন বাঁকা চোখে দেখেন কেন? ঝগড়া করা দেখছি আপনার স্বভাব!

হ্যাঁ। অনেক—অনেক দোষ আমার।

তবুও হালকা সুরে কথা বলল দেবদত্ত, এখনও তার কোন পরিচয় আমি পাই নি। তবে শুধু দুটি দোষ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েছে। অবশ্য আমার বেলায় সেগুলি গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলতে পারেন।

সুনন্দা কিছু জিজ্ঞেস করল না কিন্তু মাথা তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেবদত্তর দিকে। অর্থাৎ সে জানতে চায়, দোষ বা গুণ যা-ই হোক, সেগুলি কি।

সুনন্দার মনের ভাব সহজে বুঝতে পেরে দেবদত্ত কথার জের টানল, আপনার জেদ আর অভিমান বোধ হয় রীতিমতো বেশি?

তবু সুনন্দা নীরব।

দেবদত্ত হেসে বলল, ও দুটো রিপুর বশবর্তী হয়েই তো আপনি আমার কাছে আসেন—

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

নির্ভয়ে বুঝিয়ে দেব?

সুনন্দা মাথা নাড়ল।

কিছু মনে করবেন না?

আপনি কি কারুর কিছু মনে করবার ধার ধারেন?

নিশ্চয়ই, একটু থেমে দেবদত্ত বলল, আপনার বেলায় বোধ হয় একটু বেশিই।

কেন আমার এ সৌভাগ্য বলতে পারেন?

সৌভাগ্যের কথা বলবেন না, সন্দেশের বাক্স খুলতে খুলতে দেবদত্ত বলল, আজ নয় আর একদিন বলব।

যদি আপনার সংগে আমার আর দেখা না হয়?

দেখা হবে না মানে? আজ বিকেলে অনিলের ওখানে যেতে হবে, দেবদত্ত সুনন্দার ভাষা অনুকরণ করে বলল, কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, আগামী শনিবার আমি আপনাদের বাড়ি যাবই।

আমি যদি আপনার কাছে আর গান না শিখি?

গান শিখবেন বলে কোনদিনও তো আসেন নি।

সুনন্দা অবাক হল, তাহলে কেন আসি আপনার কাছে?

চোখে কৌতুক ফুটিয়ে দেবদত্ত বলল, শুধু জেদ আর অভিমানের তাগিদে।

সন্ত্রস্ত হয়ে সুনন্দা বলল, দয়া করে একটু সোজা ভাষায় কথা বলবেন? আপনার কথা বোঝবার মতো বুদ্ধি যে আমার নেই তা তো জানেন।

আপনার শুভ বুদ্ধির তুলনা নেই। কিন্তু সেকথা যাক, একটু চুপ করে থেকে দেবদত্ত বলল, আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আপনার অলক্ষ্যে আমি অভদ্রের মতো ব্যবহার করেছিলাম বলে প্রবল অভিমান হয়েছিল আপনার—

অভিমান কেন?

রাগই বলুন। কিন্তু আমি বলব অভিমান। তাই একটা প্রচণ্ড জেদে আমাকে প্রতিশোধ দেবার জন্যে আপনি ছটফট করতে লাগলেন এবং দিলেনও—

সুনন্দা কঠিন স্বরে বলল, রাগ অভিমান যা-ই থাক, প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি আমার একেবারেই নেই।

দেবদত্ত বলল, আপনি একটু ভুল করছেন। প্রতিহিংসারও জাত আছে। সব সময় তা যে ক্ষতিকর তা তো নয়—আমার বেলায় তো নয়ই।

হঠাৎ ভয় করতে লাগল সুনন্দার। কিসের ভয় তা সে ঠিক বুঝতে পারল না। তার মনে হল সে দেবদত্তর কাছে ধরা পড়ে গেছে। তার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কেমন করে সে মানুষের মনের গভীরে এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি বুলোতে পারে।

দেবদত্তর দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ তাকাতে পারল না সুনন্দা।

চাকর যথাসময় বাজার থেকে ফিরে এসে চা করল। দেবদত্ত সন্দেশ প্লেটে সাজিয়ে এগিয়ে দিল সুনন্দার সামনে। কিন্তু সে স্পর্শ করল না একটিও।

খেতেই হবে আপনাকে।

আমি মিষ্টি খাই না।

তবে অন্য কিছু খান।

আমি খেয়ে এসেছি। অসময়ে কিছু খেলে আমার শরীর খারাপ হয়।

আমার কথায় কিছু মনে করলেন নাকি?

তেমন কিছুই তো আপনি বলেন নি।

কি জানি।

সুনন্দাকে তারপর ট্রাম লাইন অবধি পৌঁছে দিল দেবদত্ত। যদিও সে আর একবারও শনিবার তাদের বাড়িতে তার যাবার কথা উচ্চারণ করে নি তবুও দেবদত্ত হাঁটতে হাঁটতে বলল সে ঠিক যাবে এবার। সুনন্দা যেন নিশ্চয়ই তার জন্যে অপেক্ষা করে।

সুনন্দা কোন উত্তর দিল না। রাসবিহারী অ্যাভিনিউএর মোড়ে সেই গাছতলায় দেবদত্তর সংগে দাঁড়িয়ে বালিগঞ্জের ট্রামের অপেক্ষা করতে করতে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। আপন মনে। হাওয়ায়। আলোয়। বেদনায়। যন্ত্রণায়। এ আরম্ভের যেন শেষ নেই।

অনিলের বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বম্বে থেকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল শরৎ ব্যানার্জি। আসল কথা লিখল শেষের দিকে।

যদিও এখন অনিলের মনের অবস্থা ভাল নয়, সে নতুন কাজের ভার নিতে পারবে কিনা শরৎ জানে না। তবু সে তার বিশেষ বন্ধু আর আজও বন্ধুদের কথা সব সময় মনে পড়ে বলেই শরৎ একটা কাজের ব্যবস্থা প্রায় করে রেখেছে। অনিলের মত পেলে সে চুক্তি পাকা করে ফেলবে।

কৌশলে সামান্য বিদ্রূপও করেছে শরৎ। লিখেছে, এ কাজের ভার নিলে মান যাবে না অনিলের। প্রডিউসার নতুন ধরনের একটা সংগীতবহুল ছবি করতে চায়। তার সংগে আলোচনা করে শরৎ বুঝেছে অনিলের মতো গায়ক এই ছবির সংগীত পরিচালনা করলে সে খুশি হবে। আর শরৎ যখন রয়েছে সেখানে তখন অনিলকে পারিশ্রমিকের কথা কিছু ভাবতে হবে না। সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক তাকে পাইয়ে দেবে শরৎ।

এই চিঠি পেয়েই যেন অনিল শরৎকে জানায় সে এই কাজের ভার নিতে পারবে কি না। কারণ সাত আট দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। যদি অনিল রাজি থাকে তাহলে কলকাতা থেকে বম্বে অবধি প্রথম শ্রেণীর ভাড়া শরৎ তাকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবে।

শরতের চিঠি বারবার পড়ল অনিল। আর তার মনের গভীরে উন্মাদনার ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল একের পর এক।

না ভাবেবার কিছু নেই।

শরতের আহ্বানে সাড়া দেবে অনিল, এ কাজের ভার গ্রহণ করবে!

সব সুদ্ধ কত টাকা পারিশ্রমিক পাবে সে জানে না—জানতে চায়ও না। শুধু দু হাজার টাকা তার চাই যত তাড়াতাড়ি হয়।

এই অবস্থায় কলকাতায় বসে গান গেয়ে আর সামান্য চাকরি করে হয় তো অনেক বছর লাগবে তার দু হাজার টাকা জমাতে। কিন্তু তত দিন অপেক্ষা করতে পারবে না অনিল। যত শিগগির হয় অমিতার টাকা শোধ করে দেয়া দরকার।

অনিলের বুকের মাঝখানে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো সারা দিন খচ খচ করে ওঠে সেই দু হাজার টাকার ভাবনা।

অমিতা কিছু মনে করুক বা না করুক, তার মতো ভাবনা ভাবুক বা না ভাবুক, অনিল এ কৃপা সহ্য করতে পারবে না।

একেবারে প্রথম থেকেই অনিল এ বিষয় সতর্ক ছিল। তার বিশ্বাস সমান সমান না হলে মনের সেতু বন্ধন সম্ভব নয়।

অমিতাকে কেন সে নিচে নামিয়ে আনবে! তাকে পাবার জন্যে কেন উঠবে না ওপরে! ক্ষমতা থাকতে কেন অক্ষমের মতো শুধু তার দান গ্রহণ করে হাত-পা গুটিয়ে কৃপার পাত্র হয়ে বসে থাকবে!

এমন করে কি বেঁচে থাকা যায়! প্রেমও বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

এ ভাবনা তার মন থেকে এত দিন দূর করে দিয়েছিল অমিতা। রূপের জোয়ারে, মন-ছোঁয়া কথায়, প্রাচুর্যের ছটায়।

সরোজনাথ বেঁচে গেলে অনিল কি করত বলা যায় না। কিন্তু চোখের ওপর তার মৃত্যু দেখে একটা জ্বলন্ত ক্ষোভ আচ্ছন্ন করেছে তার সারা মন।

অমিতার দু হাজার টাকা শোধ না করা অবধি তার শান্তি নেই। দৈন্যের গাঢ় কালিতে যেন ঢেকে গেছে তার প্রেম।

লজ্জায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায় অনিল।

শরতের চিঠি অমিতার সামনে নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিয়ে অনিল বলল, পড়ে দেখ।

এমন স্বরে কথা বলল অনিল যে অমিতার বুকে আশঙ্কার হিম শিহরণ বয়ে গেল। চিঠিতে কি লেখা আছে, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি-না, এ চিঠি তার পড়া উচিত হবে কি-না সে সব কথা ভাববার অবসর পেল না সে। ক্ষিপ্র ব্যগ্র হাতে চিঠি নিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়তে লাগল।

সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কাঠিন্য এনে অনিল বলল, আমি উত্তর লিখে দিয়েছি। শরৎ ভাড়াটা পাঠিয়ে দিলেই বম্বে চলে যাব অমিতা—

কাটা কাটা কর্কশ দৃঢ় কণ্ঠস্বর অনিলের। শোকে মানুষ কোমল হয় বলেই তো অমিতার জানা ছিল—কঠোরও হয় তাহলে।

কে বুঝবে শোকের কলা-কৌশল!

ভিজে ভারী গলায় অমিতা থেমে থেমে বলল, তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে?

উত্তর যেন সাজান ছিল অনিলের, উপায় কি? সখের গান গেয়ে আর কত দিন লোকের কাছে হাত পাতব?

কই, এখনও তো কারুর কাছে হাত পাততে হয় নি তোমাকে—

ও কথা থাক। এ সুযোগ আমি ছাড়ব না অমিতা।

নিজের বুকে একবার হাত বুলিয়ে নিল অনিল। সেই দু হাজার টাকার কাঁটা অমিতার সাড়া পেয়ে হঠাৎ ঘন ঘন খোঁচা দিচ্ছে।

যেন কোন এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘোরে আমেজে ঈষৎ শিথিল স্বরে অনিল বলল, এবার গান গেয়ে কিছু টাকা করে নিতে চাই। কোন দিন গলা খারাপ হয়ে যায় ঠিক কি!

টাকার তোমার কি দরকার অনিল?

সব সময় সকলের টাকার দরকার, শুকনো কিন্তু তীক্ষ্ণ হাসি হাসল অনিল।

সেকথা না জানবার মতো বোকা মেয়ে অমিতা নয়। অন্য অর্থে অনিলকে সে এ প্রশ্ন করেছিল। মনে মনে ভাবছিল তার যা সম্পত্তি সবই তো অনিলের হবে অদূর ভবিষ্যতে। তবে কেন সে টাকার ভাবনা ভেবে তাকে ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে শুধু শুধু দূরে চলে যেতে চায়।

আরও কিছু বোঝে অমিতা। অনিলকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত হয়ে তবে সে তার বাবার অস্ত্রোপচারের টাকা দিতে পেরেছিল।

জীবনটা কেমন যেন বিস্বাদ মনে হয় অমিতার। তেতো তেতো লাগে প্রেম। শান্তি আসে না। জ্বালায় জ্বলে মন। সহজ পথটা হঠাৎ বাঁকা হয়ে যায়।

দোষটা কার? তার না অনিলের?

সেকথা বুঝতে বোধহয় আরও খানিকটা সময় লাগবে অমিতার।

কিন্তু কঠিন কোন ভাবনা সে করে নি। দুরূহ কোন কাজ সে করতে যায় নি। শ্বেত পদ্মের পাপড়িতে নিটোল স্বচ্ছ শিশির বিন্দুর মতোই সে-ভাবনা সুন্দর। ফুলের ফুটে ওঠার মতোই সে কাজ সহজ। উত্তুঙ্গ পর্বতের কাছে উদ্দাম ঝড়ের আত্মসমর্পণের মতোই তা একান্ত স্বাভাবিক।

বৃহত্তরো মহত্তরো কল্পনায় অমিতা তো আত্মসমর্পণই করতে চেয়েছিল অনিলের কাছে। তাহলে কেন পরিধি গুটিয়ে নিয়ে সে দূর রচনা করবে!

স্পষ্ট করে অনিল কিছু না বললেও অমিতা বুঝতে পারে যে-মুহূর্তে তার কাছে থেকে টাকা নিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে সে যেন অন্য আর একজন হয়ে গেছে। অনিলের তার কাছে এত সঙ্কোচ কেন, এই ছোট তুচ্ছ কথাটা মাথায় ধরতে পারছে না অমিতা। সে নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়, তার সব কিছু নিয়ে এক হয়ে যেতে চায় অনিলের সংগে। তাই তাকে গ্রহণ করতে সে কার্পণ্য করলে জীবন বিস্বাদ লাগে অমিতার!

তবু অমিতা বলল, টাকা এখানেও রোজগার করতে পার। বাঁশধানির জলসায় গাওয়া আমাদের গান দু একদিনের মধ্যেই তো রেকর্ড করা হবে!

তাতে আর কত পাব?

কিছু বলা যায় না। তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে সেদিনকার গান নিয়ে লোকে এত মাতামাতি করবে?

লোকে মাতামাতি করলেই টাকা পাওয়া যায় না।

অমন বিশ্রী করে 'টাকা' কথাটা উচ্চারণ করল কেন অনিল! ক্ষুধা আর লালসায় চকচক করছে তার চোখ। শোকে মাথা বিগড়ে গেল নাকি!

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, তার মত পরিবর্তন করবার চেষ্টা করে অমিতা স্বরে দরদ মিশিয়ে বোঝাল, লোকের মনে সাড়া জাগাতে পারলে তার মূল্য নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

অনিল বলল, সোজা কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন অমিতা যে বম্বে গেলে কম পরিশ্রম করে অনেক বেশি টাকা আমি পাব?

তুমি পরিশ্রম করতে ভয় পাও অনিল?

না। কিন্তু পণ্ডশ্রম করতে আর রাজি নই।

পণ্ডশ্রম তুমি কাকে বলছ?

আজ থাক। বম্বে থেকে কোন একদিন ফিরে এসে সে-কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

যতদূর আস্তে বলা যায় তত মৃদু স্বরে অমিতা বলল, আমি কিছু বুঝতে চাই না। কিন্তু কৃত্রিম পরিবেশে তুমি কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে?

অনিল হেসে বলল, কে না মানিয়ে নেয় আজকাল? শরৎ মানিয়ে নেয় নি?

তেমন গান তুমি তো কখনও গাইতে চাও নি।

আগে বুঝতে পারি নি, সিগ্রেটের ছাই ঝাড়ল অনিল, এখন আমার সখ মিটে গেছে অমিতা।

সখ? ফ্যাকাশে হয়ে উঠল অমিতার চোখ।

আর একটু মধুর করে কথাটা অমিতাকে বোঝাবার জন্যে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে থেমে থেমে অনিল বলল, একদিন তেমন গান গেয়েছিলাম বলেই তো আজ আমার ডাক এসেছে। শরৎ আমার মুখ দেখবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠায় নি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে অমিতা বলে উঠল, যাদের দিয়ে কাজ হয়, পরের তালে তাল মেলাবার জন্যে তাদেরই তো ডাক আসে। এবার থেকে তোমাকে পরের কাজই করতে হবে। আমি শুধু সেই কথাটাই ভাবছি।

কিন্তু চিরকাল আমি পরের কাজ করব না অমিতা। কিছু টাকা করেই আমি ফিরে আসব কলকাতায় গান গাইতে। শরৎ কি আসে না?

আসে, এতক্ষণ পর শাণিত হাসি হাসল অমিতা, নিজের সখের গান গাইতে আসে না, ব্যবসা করতে আসে, টাকা পাবে বলে শুধু অন্যের অনুরোধ রক্ষা করে যায়।

আমি তা করব না। কিছুদিন পরে ফিরে এসে আমি আবার তোমাদের সংগে ঠিক আগের মতোই গান গাইব—

অমিতা হাসল, এই সমাজের অব্যর্থ নিয়ম তুমি কেমন করে ব্যর্থ করবে অনিল ?

ঠিক করব।

আর বলে কি হবে। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মৃত্যুর কঠিন স্পর্শ লেগেছে অনিলের মনে। সাপের ছোবলে দেহ নীল হয়ে গেছে।

তবু তাকে বাঁচাবে অমিতা।

আজ নয়। কাল নয়। দু একদিন পরেও নয়।

অনেক—অনেক দিন পর। ভেলা ভাসিয়ে। সিন্ধু পার হয়ে। ঝড় ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে।

অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভয় লাগে অমিতার। এর মধ্যেই সে যেন অনেক দূরে চলে গেছে। অমিতাকে যেন চিনতে পারে না সে।

আজ এই মুহূর্ত থেকে ভেলা ভাসিয়ে দিক অমিতা। সর্প দংশনে মৃত প্রিয়জনের মাথা থাক তার কোলে। তীর থেকে ক্ষণে ক্ষণে আসুক মেকী জীবনের মধুর হাতছানি। উদ্দাম উত্তাল হয়ে উঠুক মহাসিন্ধু।

তবু ভেলা তীরে নিয়ে যাবে না অমিতা। ভাগ নেবে না আনন্দের যতক্ষণ না সে ফিরে পায় মৃত অনিলের প্রাণ।

কিন্তু কোথায় সেই ব্যঙ্গ রসিক নিষ্ঠুর দেবতারা ? যারা মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে হলে শোকজর্জর তপস্বিনী বেহুলাকে নৃত্যে গীতে প্রথমে তাদের তুষ্ট করবার আদেশ দিয়েছিল ?

তেমন দেবতার সন্ধান কোনদিনও করবে না অমিতা।

ঘর ভাঙার জ্বালা বুকে নিয়ে এখান থেকে সেখানে অক্লান্ত যন্ত্রের মতো ছুটে বেড়ালেও মধুর আর শান্ত ভবিষ্যৎ নীলার মনে হয় তো মাঝে মাঝে করাঘাত করে যেত।

যন্ত্রণা যত দুঃসহ হোক, নিজের জীবনকে ব্যর্থ বলে কোনদিনও ভাবতে পারে নি সে। জীবনের তামাসার গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল কটু অস্পষ্ট সমাজ বোধের প্রেরণায়।

বোধ একটা ছিল বৈকি নীলার। কিন্তু মধুর ভাগটা নিতান্ত কম সেখানে। তাই অন্যকে খোঁচা মারতে গিয়ে অজান্তে যেন হুল ফোটাত নিজেকেই। আর ভাবত যারা ভীরু, যারা কাপুরুষ তারাই সুবিধার জন্যে মাথা নিচু করে—ব্যক্তিত্বের বালাই নেই বলে মানিয়ে নেয় সর্বত্র।

কিন্তু একটা কথা নীলার বোধ হয় খেয়াল ছিল না যে মাথাটা সর্বক্ষণ উঁচু করে রাখতে গেলে মনটাকেও সেই অনুপাতে বাড়িয়ে নিতে হয়। তাহলে কারুর ছোট দরজায় কিংবা দেয়ালে ধাক্কা খেতে হয় না।

মাথা একটু নামিয়ে ছোট দরজা কিংবা দেয়াল এড়িয়ে আঘাত বাঁচিয়ে যাওয়া মাথা নিচু করে চিরকাল থাকা নয়—সুবিধার কথা ভাবাও নয়—শুধু মনটাকে আর এক ধাপ ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া।

ঠাণ্ডা মাথায় শান্ত মনে না চলতে পারলে বেশি দূর যে অগ্রসর হওয়া যায় না সেকথাটা বোধ হয় একমাত্র নীলা ছাড়া আর সকলেই জানত!

তবে বয়সের কথাও ভাববার দরকার বৈকি। মাথা গরম হয়ে ওঠা অনেক ক্ষেত্রে তো বয়সের দোষ। তা না হলে নীলা জনে জনে ডেকে ঝাঁঝালো ভাষায় নিজের কাহিনী বলতেই বা যাবে কেন

তবে একদিন অমিতার বাড়িতে বসে ধৈর্য ধরে নীলা সেই বাঁশ-খানির নিখিলের কাহিনী শুনেছিল।

সেই ঘর-ভাঙারই কাহিনী।

কিন্তু নিখিলের কথায় ঝাঁঝ নেই। কারুর ওপর কোন আক্রোশ নেই। শান্ত সতর্ক মন দিয়ে আবার ঘর গড়ে নেবার স্বপ্নে সে বিভোর।

তারপর আর একদিন কালিঘাটে নিজের বাড়িতে বসে নিখিলকে তার সংসারের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যাবার কথা খোলাখুলি ভাবেই বলেছিল নীলা। ভাষা যথা সম্ভব সংযত করবার চেষ্টা করেছিল, জ্বলুনিও দাবিয়ে রেখেছিল সাধ্য মতো।

কিন্তু নিখিল কি বুঝল কে জানে। এক মুহূর্ত ভাবল না, কোন দুঃখ প্রকাশ করল না, আর পাঁচজনের মতো সান্ত্বনাও দিল না নীলাকে।

সহজ ভাবে ছাড়া ছাড়া স্বরে পৃথিবীর যত বিপক্ষ শক্তিকে অগ্রাহ্য করবার ভংগিতে বলল, কোন আঘাত গায়ে মাখতে নেই। সব চেয়ে আগে ধাক্কা খেয়ে যে ময়লা গায়ে লেগেছে তা মুছে ফেলা দরকার।

নিখিলের নির্বিকার ভাষা শুনে নীলার বুক ঠেলে তর্ক করবার বাসনা জাগল। ভাবল কতই বা বয়স নিখিলের। জীবনের কি জানে সে। তাই অন্যের দেহমন ঝলসে গেলে কেমন করে ক্ষত অনুভব করতে পারে না। সেই কারণেই সব কথা শোনায়।

নীলা বলল, ময়লা মুছে ফেললে আঘাত মুছে যায়। মাথাটাও নিচু হয়ে যায়।

না, যেন কিছু ভাববার দরকার হয় না নিখিলের, আঘাত মুছে ফেললে মাথা নিচু হয় না। বরং বরাবরের জন্যে উঁচু রাখতে গেলে সেটা করা নিতান্তই দরকার।

কিন্তু আঘাত মুছে ফেললে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেও যে মন থেকে চলে যায়?

যাক না, শান্ত হাসি হাসে নিখিল, প্রতিশোধের ভাবনা ভেবে মনটাকে জংলী করে তুলে কারুর কোন লাভ নেই। আসল প্রয়োজন হল প্রতিকারের—প্রতিশোধের নয়।

নীলা তবুও বলে, কিন্তু অকারণে যে ধাক্কা মারল তাকে পাল্টা আক্রমণ করা দরকার বৈকি।

নিশ্চয়ই, নিখিলের মুখ দেখে মনে হয় এসব প্রশ্ন সে অনেক জায়গায় অনেকবার শুনেছে, শুধু তাকে নয়, তার দলবল সকলকে আক্রমণ করা দরকার, একটু চুপ করে থেকে ভারীক্কি চালে নিখিল আবার বলে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া তেজী মানুষের মতে যুক্তি সংগত নয়।

নীলা হেসে বলে, তবে ?

নিখিলও হাসে, কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করতে গেলে প্রস্তুতি দরকার। আর মাথা ঠাণ্ডা না করে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়। মাথা গরম থাকলে মনের ফোঁসফোঁসানিতে ঠিক জায়গায় আঘাত না-ও লাগতে পারে। কিংবা আবার আঘাত খেতে হতে পারে। তাই সব দিক বিচার করে কাজ সারতে গেলে আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে মনটাকে শান্ত রাখতে হবে। উত্তেজনা না কমলে দৃষ্টিও খুলবে না।

মাথা উঁচু-নিচু নিয়ে মাথা ঘামাল ওরা ঘণ্টা খানেক। নিখিলই সার কথা শোনাল নীলাকে। সে চলে যাবার পর বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে তার বলা কথাগুলি মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দেখছিল নীলা।

বয়স অল্প হলে হবে কি, খাঁটি কথা বলে নিখিল। ভাবতে ভাবতে নীলা বেশ তাজা হয়ে ওঠে। জ্বালাটাও যেন কমে যায়। আর ভাবে, আবার কবে আসবে নিখিল।

বাঁশধানির জলসার পর নীলার পাশে পাশে অনেকক্ষণ ঘুরেছে নিখিল। তার বুড়ো বাপের সংগে আলাপও করিয়ে দিয়েছে। যখন খুশি আবার আসতে বলেছে তাদের বাড়িতে।

আসবে না কেন নীলা? বারবার আসবে।

নিখিলও যেন যায় তাদের বাড়িতে।

নিখিলের বুড়ো বাপের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তৃষ্ণা মাখান চোখে এ পাড়ার ঘর বাড়ি দেখে নীলা।

বাড়ির ভিৎ কাঁচা হলে হবে কি, সংসারের ভিৎ এখানে পাকা। অলীক সম্পদের আড়ম্বর নেই। ঠাট বজায় রাখবার তিক্ত ভাবনা নেই। ভানের আবরণে সাজিয়ে মুক্ত জীবনকে পঙ্গু করে রাখবার চেষ্টাও নেই।

সুস্থ সংযত শান্ত মধুর জীবন। সংসার ভেঙে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই এখানে।

এমন দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার ক্ষমতা নীলার আগে ছিল না। জীবনের রঙচঙে খোলসটাই আঁকড়ে ধরতে চাইত সে। তার বাবার মতোই পারিপার্শ্বিক আড়ম্বর মন মাতাতো তার।

তাই আসল মানুষটাকে খুঁজতে গিয়ে ধাক্কা খায়। হতাশ হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করে। আড়ম্বর শুধু ব্যঙ্গ করে তার নিজের জীবনকে।

যেন সব দোষ নীলার।

গলার স্বরে অনুতাপের আঁচ ধিক ধিক করে ওঠে, জান নিখিল, লোভ করেছিলাম। ঝকঝকে নকল জিনিশের মোহে আসল জিনিশটা চিনতে শিখি নি। তাই লোভের শাস্তিও পেয়ে গেলাম।

শাস্তি নয়, বল আঘাত। দু একটা কড়া ধাক্কা না খেলে বাঁকা জীবনটা সোজা হবে কেমন করে?

কেমন বোকা-বোকা মুখ করে নীলা তাকিয়ে থাকে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। ধাক্কা খেয়েই তো চোখ খুলে গেছে তার।

কথার জের টেনে নিখিল বলে যায়, এখন আঘাতটা মুছে ফেললেই

দেখবে কত লাভ হয়েছে তোমার, ও হাসে, আসল-নকল চিনতে আর কি ভুল হবে ?

নীলা স্বর তুলে বলে, না।

এমন বোধ কজনের হয়! ধাক্কা না খেলে তোমারও এ জ্ঞান হত না।

তা বটে। ঠিক কথাই তো বলে নিখিল। স্বামীর কাছ থেকে রূঢ় আঘাত না পেলে ঠুনকো রঙীন খেলনা সাজান শিশুর খেলাঘরের মতো সংসারে সারা জীবনটাই হয়তো কাটিয়ে দিত নীলা। একটার পর একটা খেলনার আব্দার করেই খুশি থাকত। রঙের স্তূপে চুপসে যাওয়া প্রাণের ধুকধুকানি তার কানে যেত না।

মঙ্গলের জন্যেই সব কিছু বোধ হয় ঘটে এ পৃথিবীতে। স্বামীর সংসারে মানিয়ে নিতে পারে নি বলেই তো ছাড়পত্র লাভ হয়েছে নীলার বিশ্বসংসারে প্রবেশ করবার।

এত প্রাণের ছটফটানি, শক্তির এমন বিপুল প্রকাশ, বাস্তব জীবনের এমন কঠিন আর মধুর রূপ—খেলনা ভরা খেলা ঘরে বসে চোখ বুজে দিন কাটালে কেমন করে দেখত নীলা!

তাই একটু একটু করে জ্বালা আর আক্ষেপ আর বিক্ষোভের আবর্জনা পেরিয়ে উত্তেজনাহীন শান্ত মনের সন্ধান পায় নীলা। অন্য আর এক দিগন্তের স্বপ্ন নামে তার চোখে। পরাজয়ের গ্লানির চিহ্ন নেই সেখানে। জয়ের দুরন্ত উল্লাসও নেই। উপলব্ধির গাঢ় স্পষ্ট রঙ শুধু জ্বলে। আর সব চেয়ে ওপরে থাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব।

ধাক্কা খেয়ে শুধু নীলার একার চোখ খোলে নি, সুশীল বাবুরও খুলেছে। আড়ম্বরের অহঙ্কার বোধ হয় এমনি করে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। আজ হোক, কাল হোক যা ভাঙবার তা তো ভাঙেই একদিন।

সুশীল বাবু বলেন, নিখিল ছেলেটি বেশ, না রে নীলা ?

নীলা ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকে। উত্তর দেয় না। সুশীল বাবু এর পর কি কথা বলবেন, কিসের ইংগিত করবেন তা বোধ হয় সে বুঝতে পারে।

এরাই তো হীরের টুকরো ছেলে, সুশীল বাবু বেশ জোরের সংগে বলেন, ছাই থেকে এরা সোনা ফলায়।

নীলা আস্তে বলে, পড়াশুনোয় ও খুব ভাল ছিল বাবা।

তা আর আমি বুঝতে পারি না? সুশীল বাবু হেসে ওঠেন, বুঝলি মা, এমন ছেলেকে দেখিয়েই বলা যায় বিদ্যাসাগরের দেশের ছেলে, টেবিলে অকারণে ঠক করে একটা শব্দ করেন তিনি, কী উন্নত মন! বাপের ওপর কত ভক্তি! ছেলের মতো ছেলে নিখিল! হাজার অসুবিধার মধ্যেও এরা ঠিক সুবিধা করে নেয়। চিরদিন মাথা উঁচু করে চলে।

তবু নীলা কথা বলে না। চুপ করে কি যেন ভেবে যায়।

নীলা ভাল করেই জানে কয়েক বছর আগে নিখিলের সংগে আলাপ হলে সুশীল বাবু কি কথা বলতেন তার সম্বন্ধে। তাঁর বলার ভংগি কল্পনা করে নেয় নীলা আর ভাষাটাও যেন কানে শুনতে পায়।

একটা সাধারণ রেফ্যুজি ছোকরা, রেফ্যুজি কথাটার ওপর নিশ্চয়ই বেশি জোর দিতেন সুশীল বাবু, দুঃস্থ গাঁইয়া বাপের সংগে কুঁড়ে ঘরে থাকে আর বড় বড় কথা বলে দিন কাটায়—তার মধ্যে তুমি কি এমন প্রতিভার লক্ষণ দেখলে নীলা?

আজ নীলা ভাবতে পারে না তখন সুশীল বাবুর কথা শুনে কি উত্তর দিত সে। উত্তর দিক বা না দিক, নিখিলকে অপমান করে সুশীল বাবু যে তার মুখের ওপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিতেন সেকথা ঠিক।

কিন্তু পর মুহূর্তেই নীলার মনে হয় এত কথা মিছেই ভেবে মরছে সে। অহঙ্কার আর ঐশ্বর্যের কঠিন প্রাচীর ডিঙিয়ে নিখিলের কোনই

সম্ভাবনা ছিল না তার ত্রিসীমানায় পৌঁছবার। তাই এসব কথা ভাববার কোন মানে হয় না আজ।

দু একদিন পর নিখিল তাদের বাড়িতে এলে নীলা বলে, বাবা তোমার খুব প্রশংসা করেন যে।

আমার বাবাও তোমার কথা প্রায়ই বলেন।

কি বলেন?

তোমার মতো তেজী মেয়ে নাকি হয় না।

কিন্তু আমার মধ্যে তেজ কোথায় দেখলেন তিনি? কথাটা বলেই ম্লান হেসে নীলা তাকায় নিখিলের মুখের দিকে।

বুড়োর চোখ, নিখিল বলে, কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না ওঁদের। ওঁরা ঠিক ঠিক ধরতে পারেন সব, একটু চুপ করে থেকে নিখিল আবার বলে, শুধু তোমার তেজের কথা বলেন না, উনি আরও বলেন তুমি নাকি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা!

নিখিলের স্বর যেন সুধার ভাণ্ড উপচে দেয়। কখনও কোনদিনও এমন স্বরে কেউ কোন কথা শোনায় নি তাকে। এই পৃথিবীতে এতদিন তার জন্তে শুধু যেন অবহেলা আর অপমান জমা হয়েছিল। তাই নীলার ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। চোখে জল এসে পড়ে। সে ধরা পড়ে যায় নিখিলের কাছে।

এ কি? তুমি কাঁদছ কেন নীলা?

মৃদু স্বরে নীলা বলে, জানি না।

সান্ত্বনা দেয় নিখিল, কোন অবস্থাতেই কাঁদতে নেই। দুঃখ জয় করার চেষ্টার নামই তো সুখ।

আর আমার কোন দুঃখ নেই নিখিল।

তাহলে কাঁদ কেন?

জীবনটাকে এত দিন চিনতে পারি নি বলে।

নীলার একটা হাত ধরে নিখিল হাসে, চেনা খুব সোজা নাকি ভাব তুমি? কত ভুল করতে হয়, কত ধাক্কা খেতে হয়! খুঁজতে খুঁজতেই তো একদিন আসল জিনিশের সন্ধান পায় মনুষ—

নীলা বাধা দিয়ে বলে, আর ভুল হবে না আমার।

বাস্, তবে আর ভাবনা কি, জোরে হেসে ওঠে নিখিল, জীবনকে তাহলে পেয়ে গেছ তুমি!

তবু চোখের জল মোছে না নীলা।

অনেক দিন পর আবার পণ্ডিতিয়া প্লেসে এল দেবদত্ত।

কৃষ্ণচূড়ার সেই গাছ, পিচ ঢালা টানা রাস্তা আর মোড়ে ছোট একটা পানের দোকান আজ বড় পরিচিত মনে হল। এ পথে বহুবার যেন আনাগোনা করেছে সে।

তখনও ফাল্গুনের তাজা রোদ একেবারে মিলিয়ে যায় নি। পিচের রাস্তার ওপর কে যেন অনেক জল ঢেলেছে। তবু হাওয়ার ঝলকে ধুলো উড়ছে। ট্রাম বাসের আওয়াজ আর মানুষের কোলাহল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছে কোকিলের ডাক।

চলতে চলতে বোধ হয় কোকিলের সন্ধানে মাথা তুলে ওপরে তাকাল দেবদত্ত। সাদা আকাশে চিল উড়ছে। ছাড়া ছাড়া হালকা মেঘ স্থির হয়ে আছে। ফিকে হয়ে এসেছে গাছের পাতার রঙ।

আজও গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। সবুজ ব্লাউজ আর হালকা রঙের হলদে সাড়ি প্রকৃতির যেন দু টুকরো রঙ। কপালে টিপ জলজল করছে তার।

গেট খুলে সুনন্দা বলল, আজ না এলে আপনাকে চাকরি ছাড়বার নোটিশ পাঠিয়ে দিতাম।

গেট বন্ধ করতে করতে দেবদত্ত বলল, বুঝতে পারছি না এসে ভুল

করলাম কিনা? বরখাস্ত করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আপনি যেন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন?

ঠিক তাই। আমার জেদ আর অভিমান মুছে গেছে তাই আপনাকেও আর দরকার নেই।

দেবদত্ত হাসল। তার বলা কথা ভুলতে পারে নি সুনন্দা। নিজের সম্পর্কে সত্যি কথাটা সহজে ভোলা যায় না।

সিঁড়ি বেয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেবদত্ত বলল, সত্যি যদি আপনার জেদ আর অভিমান মুছে গিয়ে থাকে তাহলে সব কৃতিত্ব আমার একার। এত অল্প সময়ে আপনার স্বভাবের সাংঘাতিক পরিবর্তন আমিই করলাম, একটু থামল দেবদত্ত। সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছে বলল, তবে তো আমার চাকরি যাবার কথা নয় বরং পাকা হওয়া দরকার।

সুনন্দার মুখ দেখে বোঝা গেল না দেবদত্তর শেষের দিকের কথাগুলি সে শুনতে পেয়েছে কিনা। কোন দিকে না তাকিয়ে সে জোরে পাখা চালিয়ে দিল। আলো জালবার এখুনি প্রয়োজন নেই, বসন্তের অপরাহ্নের দিগন্ত ছড়ান আলোয় সারা ঘর ভরে আছে।

আজ এ বাড়িতে দেবদত্তর আসা দরকার ছিল। না এলে হয়তো আজই সুনন্দা চলে যেত সাদার্ন অ্যাভিনিউএর সেই ছোট ঘরে—যেখানে তানপুরা রাখবার ভাল একটা জায়গাও নেই।

একটা কথা আগে থেকে দেবদত্তকে বলতে পারে নি সুনন্দা। কিন্তু মার সংগে কথা বলে আয়োজন করে রেখেছে। আজ রাত্রে দেবদত্তকে সে খাওয়াতে চায়।

যদিও একদিন নেমন্তন্ন খেলেই প্রতিদিন তৃপ্তি হবে না দেবদত্তর, তবুও সুনন্দা যতবার তার বাড়িতে গেছে ততবার মনে হয়েছে,

এ ভাবে বাস করা চলে না, এমন করে থাকতে পারে না কোন মানুষ।

কিন্তু যখন উপায় নেই আর দেবদত্তর কোন স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করার অধিকার নেই তার তখন যে-কদিন সে আসবে এ বাড়িতে সে-কদিন তাকে একটু অন্য রকম রান্না খেয়ে যেতে হবে।

কৃপা নয়, করুণাও নয়। হয়তো একটা সুপ্ত স্বাভাবিক বোধ পরিবেশ অনুযায়ী প্রবল হয়ে উঠেছে সুনন্দার মনে, যার প্রেরণায় লৌকিকতার বেড়া ভাঙতে দ্বিধা হয় নি তার, মাকে খোলাখুলি ভাবে বলতেও সঙ্কোচ করে নি।

শুধু দেবদত্তকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারে নি সুনন্দা। কেননা হৃদয়ের এই বোধের সংজ্ঞা জানে না সে। তাই ভয় হয়, যদি দেবদত্ত ভুল বোঝে, যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করে তার মনের এই প্রকাশ। কিংবা কৃপা মনে করে দুঃখ পায়, অভিমান করে, যদি দম্ভে আঘাত লাগে তার!

অলকা যে কি বুঝবেন তা সুনন্দা জানত। মাকে বোঝাবার জন্যে কোন ব্যস্ততাও ছিল না তার। কারণ যেমন ভাবে সে কথা বলুক না কেন, অলকা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবেন সব কিছু। অর্থাৎ তিনি ভাববেন, একজন গরিব গায়ক বাড়িতে ভাল খেতে পায় না বলে সুনন্দা তাকে খাওয়াতে চায়।

শুধু অলকাকে দোষ দিলে চলবে কেন, সব শুনলে হয় তো যে কোন লোক এমনি একটা ধারণা করে বসবে।

তবু সন্দেহ কেঁপে গেলেও, এমন একটা প্রেরণা সুনন্দার সারা মন জুড়ে ছিল যে সে জানত আজ দেবদত্ত আসবেই। কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কোন বাধা পথ জুড়ে দাঁড়াবে না, তার মনের এই নিভৃত আমন্ত্রণের খবর সে পাবেই।

আজ তাকে আসতেই হবে এ বাড়িতে

একটুও ইতস্তত না করে সহজ স্বরে সোজা ভাষায় সুনন্দা দেবদত্তকে বলল, আজ আপনাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে—

কেন? সুনন্দার আপাদমস্তক সপ্রশ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, আজ কি?

আজ? হেসে উঠল সুনন্দা, আজ আবার অনেক দিন পর আপনি এ বাড়িতে এলেন। মনে নেই, সেই রাগ করে চলে গিয়েছিলেন?

নাঃ, মানুষকে বড় জব্দ করতে পারেন আপনি, কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে ভরা দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই কথা বলল দেবদত্ত, অভদ্রতা করে কেউ চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে এনে এমন যত্ন করতে বোধহয় একমাত্র আপনিই পারেন। সেদিন বলেছিলাম না প্রতিহিংসারও জাত আছে?

দেবদত্তর কথা শেষ হবার সংগে সংগে সুনন্দা বলে উঠল, শুধু আমার একার প্রশংসা করছেন কেন। কেউ রাগ করে চলে গেলে সকলেই ত্রুটি সংশোধন করবার চেষ্টা করে। আপনার বাড়ি থেকে আমি যদি অমন করে চলে আসতাম—

দেবদত্ত হেসে বলল, আপনার রাগ জল না হওয়া অবধি আসতেই দিতাম না আপনাকে।

আমিও যদি সেদিন বাড়ি থাকতাম তা হলে কিছুতেই আপনি অমন করে চলে যেতে পারতেন না, প্রবল আত্মবিশ্বাসে সুনন্দার মুখ একেবারে অন্য রকম দেখাল।

আমার ভাগ্য ভাল সেদিন আপনি ছিলেন না। যদি থাকতেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হত আমার, হাতের কাছের ছাইদানটা একটু সরিয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখে সেটার দিকেই দৃষ্টি দিয়ে দেবদত্ত বলল, তাহলে অনেক কিছুই আমার জানা হত না—আপনাকেও নয়।

হঠাৎ হাওয়ার ঝলকে শিহর লাগা রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো সুনন্দা চমকে উঠল। ঘন পাতার আড়ালে ছড়ান সুবাসের বিহ্বল আমেজ ছিল দেবদত্তর কথায়। আলো জ্বালবার হয় তো এখুনি তেমন প্রয়োজন ছিল না। বাইরে অন্ধকার হয় নি এখনও। ঘরেও পড়ে নি কোন ছায়া। তবু আলো জ্বেলে দিল সুনন্দা।

অল্প অন্ধকারে মনের আগল ভেঙে যে কথাগুলি হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে আসতে চায়, আলোর রেখায় তারা যেন বাধা পায়। মনের মধ্যেই ভিড় ক'রে ছটফট করে।

তাই করুক।

দেবদত্তর কথা একেবারে পরিবর্তন করে দেবার জন্যে ভেবে ভেবে থেমে থেমে সুনন্দা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ওই বাড়িতেই থেকে যাবেন ঠিক করলেন?

ঠিক করি নি কিছু। ও বাড়ির ওপর বিশেষ কোন আকর্ষণ তো আমার নেই। তবে যে ক'দিন থাকতে হয়—

ওখানে আপনার কোন আত্মীয়াকে এনে রাখুন।

তেমন কেউ নেই আমার।

অমন ভাবে বেশি দিন থাকলে আপনার অনেক অসুবিধা হবে। আপনি কাজ করবেন কেমন করে?

আরও বেশি অসুবিধার মধ্যে থেকেও অনেকে যেমন করে কাজ করে যায়— ,

তারা হয় তো আপনার মতো সাজান সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে নি।

শুধু সংসার ছেড়ে নয়, ঘর ভেঙে আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে এক বস্ত্রে তারা চলে এসেছে—

তাদের তো গান গাইতে হয় না। অগোছাল পরিবেশে থেকে

সংসারের খুঁটিনাটি সব হাঙ্গামা মিটিয়ে শান্ত মনে আপনি কেমন করে সংগীতের সাধনা করবেন ?

করতেই হবে। অগোছাল পরিবেশে থেকেও যারা বাঁচবার চেষ্টা করছে, তাদের প্রতিমুহূর্তের কাজে সমন্বয়ের যে সুর ভেতরে ভেতরে বেজে চলেছে আমি তো তারই প্রকাশ করতে চাই, মহৎ অনুপ্রেরণার ছটায় দেবদত্তর দু চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। শান্ত গভীর স্বর কাঁপল তার গলায়, তাইতো আজকের সুর—আগামী কালের সুর।

ইচ্ছে করেই অনেকক্ষণ সুনন্দা কোন কথা বলল না। ভেতর থেকে কাঁচের বাসন সাজাবার মিষ্টি শব্দ ভেসে আসছে। বাইরে শোনা যাচ্ছে লোহার ওপর হাতুড়ি মারার একটানা বিলম্বিত আওয়াজ। মাথার ওপর পাখা চলছে।

বেলা যেন শেষ হয়েও ফুরোতে চায় না। জানলা দিয়ে দেখা যায় রাস্তার ওপারে ওই নতুন দোতলা বাড়ির কালো থামের আশে পাশে ফিকে গৈরিক আভা ছড়িয়ে রয়েছে। সন্ধ্যের আর দেরি নেই।

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ বসে থাকবারও কোন মানে হয় না। তাই নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্তে সুনন্দাকে বলতেই হল, এবার আমাকে গানের পাঠ দিন। অন্তত একটা গানও শেখান।

দেবদত্তর মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু আজ থেকে আমি যে আপনার চাকরি ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।

কেন ? নিস্তেজ বিচলিত স্বরে সুনন্দা জিজ্ঞেস করল, আবার কি অপরাধ করলাম ?

অপরাধ নয়, অবরোধ করেছেন। আপনাকে অন্য কোন গান শেখাতে গেলে এখন শুধু ছলের সুরই বাজবে।

ভয়ার্ত চোখে দেবদত্তর দিকে তাকিয়ে কিছু না বোঝবার ভান করল সুনন্দা, আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কিন্তু দেবদত্তর এতটুকু সঙ্কোচ নেই। স্পষ্ট সহজ তার প্রত্যেকটি কথা, যে-সুর আপনার মনে আপনি বেজে উঠেছে তার চেয়ে গভীর সুর—তার ওপরে কোন গান পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ভীত ত্রস্ত পাখির মতো মনে হল সুনন্দাকে। আশঙ্কায় উত্তেজনায় শিহরিত হিম হয়ে যাওয়া দেহ সামান্য সোজা করে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, আপনি ভুল করছেন—

ভুল ? লোকাতীত তৃপ্তির আলোয় মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেবদত্তর, সমবেদনার গভীর গান বাজলে বোধহয় বধিরও শুনতে পায়। আমার ভুল হবে কেন ?

এবার থেমে যাক দেবদত্ত। আর শুনতে চায় না সুনন্দা। সে আর সহ্য করতে পারবে না। তীরের শাণিত ফলার মতো তার কথাগুলি একটি একটি করে যেন শিরা কেটে দিচ্ছে সুনন্দার।

কিন্তু তখনও কথা বোধহয় শেষ হয়ে যায় নি দেবদত্তর। লৌকিকতার পুরু ঢাকনা টুকরো করা, সঙ্কোচের সব আবরণ ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া আযোজন মাতানো চিরকালের এক প্রাকৃতিক রাগিনী কখন দেবদত্তর মনের মৃদঙে বেজে উঠেছে সে-খবর হয় তো রাখে না সুনন্দা।

দেবদত্ত বলল, আপনিও আমাকে এক নতুন গান শিখিয়েছেন। সকলের অলক্ষ্যে আপনার যাওয়া, আমার খবর নেওয়া, অকারণে ব্যস্ত হওয়া—এই সুরের উৎস আমি তো কোনদিন আমার মধ্যে খুঁজে পাই নি। তাই এখন আপনি না গেলে আমার সব কিছুই যেন বেসুরো হয়ে যায়। আমি সারাদিন আপনারই প্রতীক্ষা করি।

ততক্ষণে সুনন্দা নিজেকে সামলে নিয়েছে। সংযত করেছে বেদনার

ভারে বিপর্যস্ত মন। এত বড় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়। তাকে আগাগোড়া ভুল বুঝেছে দেবদত্ত। করুণাকে সে অন্য আর এক অনুভূতি বলে মনে করেছে। কৃপার নাম দিয়েছে প্রেম। মমতাকে ভেবেছে ভালবাসা।

কয়েক মিনিট কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্য নিঃশব্দে কাটিয়ে দিল সুনন্দা। তার মনের আসল কথাটা খোলাখুলি ভাবে দেবদত্তকে জানিয়ে দেয়া দরকার। সুনন্দাকে উপলক্ষ্য করে ভুলের একটি শিখাও যেন কখনও তার মনে না জ্বলে ওঠে।

সুনন্দার জেদ আর অভিমানের ফসল যে এমনি কঠিন হয়ে ফলে উঠে তাকে ক্ষত বিক্ষত করবে তার সামান্য ইংগিত যদি সে আগে পেত তাহলে সেদিন সকালে কোন মতেই সে যেত না দেবদত্তর মান ভাঙাতে।

কত কারণে এই পৃথিবীর কত লোক কত কি মনে করে, কিন্তু গলা বাড়িয়ে কে আর ফাঁস পরতে যায়? যে ফাঁসে কোন রঙ নেই, উত্তেজনা নেই, উল্লাসও নেই।

আর থাকলেও নতুন কিছু গলায় পরবার উপায় নেই সুনন্দার। প্রবঞ্চনা করবার দুর্নাম কেন সে কুড়াবে অকারণে! কেন হীরেশের স্বপ্ন ভেঙে দেবে!

তাকেই তো সর্বক্ষণ কামনা করে এসেছে সুনন্দা এতদিন। কল্পনা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে, দিন গুনেছে তার সংগে এক হয়ে যাবার।

তার সংগে আলাপের আগে এমন কাউকে চেয়েছিল সুনন্দা যাকে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে তার মা-বাবা বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-আত্মীয়া।

সে যেই হোক, একজন গায়ক নয়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একসংগে এত কথা ভেবে শান্ত সংযত কিন্তু

কঠিন স্বরে সুনন্দা বলল, হাঁ, আপনি ভুল করছেন। দেখুন, গান শেখবার কোন ইচ্ছে আমার কোনকালেই ছিল না। আপনি জোর করেছিলেন বলেই আমি রাজি হয়েছিলাম। তারপর আপনার অবস্থার পরিবর্তন দেখে আমি আপনার জন্যে অনুভব করেছিলাম সেকথা ঠিক। সে-অনুভূতিকে আপনি কৃপা করুণা কিংবা মমতা বলতে পারেন কিন্তু কখনও অন্য কিছু মনে করে ভুল করবেন না—

স্বাভাবিক হাসি হেসে দেবদত্ত বলল, কেন আপনি বারবার ভুল করবার কথা তুলছেন? এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ছেড়ে ছেড়ে দেবদত্ত গুঞ্জন করল, কৃপা করুণা মমতা—এই তিনটি ছোট 'কথা মিলেই তো একটি বড় সুর বাজায়। আমি সেই সুরই শুনেছি।

মনে মনে কথার অরণ্যে উন্মাদিনীর মতো হাতড়ে ফিরল সুনন্দা। কিন্তু আশ্চর্য, বলবার মতো একটি কথাও খুঁজে পেল না সে।

কথা যেন আর নেই কোথাও।

মূক হয়ে আছে ত্রিভুবন।

যতক্ষণ দেবদত্ত ছিল ততক্ষণ তার সংগে একটি কথাও বলেন নি অলকা। খাবার সময় নানা প্রসংগের অবতারণা করে দেবদত্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তিনি কোন উৎসাহ দেখান নি। শুধু দেবদত্তর কি চাই না চাই জানতে চেয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেছেন।

অলকার স্বভাব সাধারণত গম্ভীর। সুনন্দার নিজের মুখেও আজ করুণ গম্ভীর একটা ছায়া পড়েছে তবুও সে লক্ষ করল অলকা শুধু চুপ করে নেই, অপ্রসন্ন হয়ে,আছেন।

খুব বেশি প্রসন্ন হয়ে থাকার কথা নয় তাঁর। যত নাম থাক, দেবদত্তর, যত বড় গায়ক হোক সে, মানুষ হিসেবেও যত মহৎ হোক, অলকার কাছে তার মূল্য কানা কড়িও নয়। তাই দেবদত্তকে

পরিবেশন করে তাঁর শ্রম সার্থক বলে তিনি মনে করতে পারছেন না। শুধু ভাবছেন এখানে আহার করে যেন অমন একজন গায়কের জীবন ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অলকার অপ্রসন্ন হয়ে থাকার আসল কারণ তা নয়। সুনন্দা সেকথা বুঝতে পারল দেবদত্ত বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করেছিলেন অলকা। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে এতক্ষণ কথা বলেন নি।

এইবার সুনন্দাকে লক্ষ করে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বর বেরুল তাঁর, এ বাড়িতে ও যেন আর কোনদিনও না আসে—

কার কথা বলছ মা?

বুঝতে পারছ না? অলকার চোখ থেকে যেন আগুনের হলকা ঠিকরে বেরুচ্ছে, কতবার তোমাকে বলেছি যার তার সংগে কখনও ঘনিষ্ঠতা করবে না—তবু গান শেখার ছল করে কেন তুমি একা একা ওই লোকটার বাড়িতে গিয়ে তাকে প্রশ্রয় দিতে? তুমি ভেবেছ কি? যা খুশি তাই করে সব নষ্ট করবে?

আমি কাউকে প্রশ্রয় দিই নি—

তাহলে কোন সাহসে সে তোমাকে ওসব কথা বলে? ও জানে হীরেশের সংগে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?

না।

কেন ওকে সেকথা জানিয়ে দাও নি?

হঠাৎ যাকে তাকে সব কথা জানাব কেন!

হঠাৎ নয়, হিংস্র নিষ্ঠুর হয়ে উঠল অলকার মুখ, তোমাদের সব কথা শুনেছি আমি। ওসব কথা হঠাৎ কেউ বলে না। বুঝতে পারছি অনেক দিন থেকে তোড়জোড় চলেছে, সুনন্দার দুই হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে তাকে ধিক্কার দিলেন অলকা, ছি ছি ছি, আমার চোখে ধুলো

দিয়ে এসব খেলা খেলতে লজ্জা করে না তোমার? আশ্চর্য, একবারও মুখ ফুটে লোকটাকে বলতে পারলে না এই বৈশাখে হীরেশের সংগে তোমার বিয়ে হবে?

যখন সব কথা শুনেছ, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে কথা বলল সুনন্দা, তখন তুমি নিজে গিয়ে ওঁকে সব কথা জানিয়ে দিলেই তো পারতে?

তাই দেব, স্বর শেষ পর্দায় তুলে চিৎকার করে উঠলেন অলকা, আর তোমাকেও বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল! নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার!

ঠাণ্ডা ঢেউএর ঝাপ্টা খেয়ে খেয়ে গ্রেনিট পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেছে সুনন্দার দেহ—স্থির মূক হয়ে গেছে।

ভারী পা ফেলে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সে নিজেকে কোন রকমে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে। তারপর দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিল।

ঘুমবার জন্যে নয়। ঘুম নেই কোথাও।

তিক্ত জাগরণ যেন একটা ভয়ংকর বিস্ফোটক হয়ে জ্বলছে। বিকট যন্ত্রণা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু অনুভব করতে পারছে না সুনন্দা। আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

অনিল বম্বে চলে যাবার আগের দিন আর নীলা-নিখিলের বিয়ের দিন দু এক পর বাঁশধানির জলসায় গাওয়া সেই গানগুলি ওরা সকলে মিলে চার খণ্ডে রেকর্ড করল।

সেই রেকর্ড বেরুবার সংগে সংগে সারা শহরে আশ্চর্য রকম সাড়া পড়ে গেল। রেকর্ডে মাত্র একটি গান গেয়ে ইতিপূর্বে বাংলা দেশের অনেক গায়ক-গায়িকা প্রসিদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এদের খ্যাতির সংগে তাদের খ্যাতির তফাত অনেক।

অন্য গায়কদের বেলায় শ্রোতারা ভালবেসেছে তাদের গান আর দেবদত্তদের রেকর্ড বেরুবার পর শুধু তা ঘরে ঘরে বেজে উঠল না, মানুষের মনে তাদের জন্যে শ্রদ্ধার ভালবাসার আলোও জ্বলে উঠল।

তাই উৎসাহী হয়ে দেবদত্ত আয়োজন করল আরও অনেক নতুন গান গাইবার।

সাড়া জেগেছে লোকের মনে, তারা উদগ্রীব হয়ে আছে তাদের কণ্ঠে অন্য গান শোনবার জন্যে। তাই প্রচুর পরিশ্রম করে শ্রোতাদের তৃপ্ত করতেই হবে।

যদিও দেবদত্তর অসুবিধা অনেক। ঠিক এই সময় অনিল চলে গেল। তার চিন্তা বুঝে অন্য লেখকের পক্ষে গান লেখা কঠিন। দেবদত্ত নিজে লিখতে পারে না। সে ভাবে, সুর গুনগুনিয়ে ওঠে তার মনে কিন্তু কথা সাজান হয় না।

তবুও দেবদত্ত আধুনিক কবিদের সংগে দেখা করে তার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছু কাজ যে না হল তা নয়, কিন্তু কোথায় যেন খুঁত রয়ে গেল। হৃদয়ের অনুভূতি ঠিক মনের মতো করে ভাষায় ধরে দিতে সক্ষম হল না অন্য নতুন কবি। তাই দেবদত্ত অনিলের অভাব আরও বেশি করে বোধ করল।

অমিতাদের বাড়িতে নতুন কবির লেখা একটা গানের সুর তুলতে তুলতে দেবদত্ত এক সময় জিজ্ঞেস করল, অনিল চিঠি লিখেছে নাকি অমিতা?

হ্যাঁ, দুটো চিঠি লিখেছে।

ও তাড়াতাড়ি ফিরে এলে বাঁচা যায়। অনেক গান লেখবার দরকার এখন। কবে ফিরবে?

শিগগির ফিরবে বলে তো মনে হয় না। ওখানে খুব ভাল আছে

লিখেছে, গিয়েই মোটা টাকা আগাম পেয়েছে। আরও অনেক পার্টি নাকি ওকে দিয়ে সংগীত পরিচালনা করাতে চাইছে—শূন্য করুণ হয়ে উঠল অমিতার চোখ। তবু জোর করে হেসে ও বলল, বেশ সুখেই তো আছে অনিল। এখন একটার পর একটা ছবিতে সুর দেবে, কত টাকা করবে! অনিলের গান এখানে ওখানে বাজবে, লোকের মুখে মুখে ফিরবে।

দেবদত্ত হেসে বলল, ভালই তো হবে।

ভাল হবে না? খুব ভাল হবে, অমিতার দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল, তবে একেবারে প্রথম থেকেই তো ও গানের ব্যবসা করলে পারত। শেষ অবধি যার ধৈর্য থাকে না তার কি দরকার ছিল শুধু শুধু লোক ঠকিয়ে ভান করবার?

অনিল ভান করে নি অমিতা। ওর চিন্তাশক্তি আছে, চিন্তার একটা বিশেষ ধারাও আছে, ও একেবারে ফুরিয়ে যেতে পারে না। ওই ছবিটার কাজ শেষ করে ও আবার কলকাতায় ফিরে আসবে।

তা হয়তো আসবে কিন্তু আমাদের মধ্যে বোধ হয় আর থাকতে পারবে না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস জোর করে চেপে গেল অমিতা, এই ব্যবসায়ী পৃথিবীতে অনিলের মতো লোকের তলিয়ে যেতে খুব বেশি দেরি লাগে না।

দেবদত্ত হাসল, তুমি তো রইলে তাকে টেনে তোলবার জন্যে—

আমার সাধ্য কতটুকু? আমি আর কি করতে পারি বল? আমার চেয়ে অনেক ঝকমকে জিনিশের সন্ধান ও বোধ হয় এর মধ্যে পেয়ে গেছে।

ঝকমকে জিনিশ দেখে ভোলবার ছেলে অনিল নয়। তুমি মিছেই ভাবনা করছ অমিতা। বাবার মৃত্যুতে জোর ধাক্কা খেয়েছে অনিল। ওর এখন মাথার ঠিক নেই। মাথা ঠাণ্ডা হলেই ও ঠিক ফিরে আসবে।

সেই আশা করা ছাড়া আর উপায় কি, অমিতার ঠোঁটে শুকনো হাসি খেলে গেল, তবে কথায় কথায় মাথা গরম করে যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় তার পক্ষে শেষ অবধি যাওয়া বড কঠিন।

ওকে সংগে করে শেষ অবধি নিয়ে যাবার জন্যে আমরা তো আছি। অনিলকে তুমি লিখে দিও ও নেই বলে আমাব খুব অসুবিধা হচ্ছে। মনেব মতো গান পাচ্ছি না একটাও। এ ছবিটা শেষ করেই ও যেন চলে আসে।

অমিতা কথা বলল না। মাথা নেড়ে জানাল সে তাই করবে।

অনিল চলে যাবার পব দেবদত্ত তার পরিবর্তন লক্ষ করে।

বেশ বদলে গেছে অমিতা। কথা বলে কম। জোব করে সব কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ প্রকাশ করে বটে কিন্তু দেবদত্ত বুঝতে পারে মনে মনে সে যেন জ্বলে যায়। কোন এক দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয় অমিতা তবু সহজে মুখ ফুটে কিছু বলতে চায় না সে।

দেবদত্ত বুঝতে পাবে কোথায় তার জ্বালা। আবার অনিলের দৈন্যের জন্যেও দুঃখ বোধ করে। আসল-নকল বাস্তব-অবাস্তব মিলে একটা অদ্ভুত ঐক্যতান বাজে তার মনে।

সে সুব সংযত করতে পারে না দেবদত্ত।

সেই শেষ দেখা।

তারপর সুনন্দাদের বাড়ি আর যায় নি দেবদত্ত। সুনন্দাও আসে নি। দেবদত্ত যে যাবে না সে কথা তো বলেই এসেছিল সেদিন। সুনন্দাও আর আসবে না।

তবু দেবদত্ত থেকে থেকে চমকে ওঠে। কান পেতে মোটরের আওয়াজ শোনে। ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ পায়।

চৈত্রের হাওয়ায় পর্দা দুলে ওঠে। টেবিলের চাদর উড়ে যায়। আর মনে হয়, সুনন্দা এসেছে।

কিন্তু কেউ আসে না।

নির্ভরের জোরালো আশ্বাস যেন দেবদত্ত পেয়েছিল সুনন্দার কাছ থেকে। মিষ্টি সুরের একটা আমেজ লেগেছিল তার জীবনে।

এমন এক মধুর স্বতঃস্ফূর্ত আমেজ যার সন্ধান তার কাজের মধ্যে কখনও পায় নি দেবদত্ত। আজ কিন্তু তার কাজের সংগে জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে। এক অপূর্বতার স্বাদ পাওয়ার আনন্দে চঞ্চল আগ্রহে উন্মুখ ব্যাকুলতায় প্রতীক্ষা করেছে সুনন্দার।

সে আসত এক আপনি বেজে ওঠা সুরের তাগিদেই। সেই সুর নিঃশব্দে কখন ভেঙে দেয় ব্যবধানের পুরু প্রাচীর। সম্পদ্ পিছনে ঠেলে দেয়। অবাস্তবের মোহ দেয় ঘুচিয়ে। বড় মন ছোট ঘর ভরে তোলে বিপুল ঐশ্বর্যে—শুধু তিনটি কথা যেখানে সারাক্ষণ কাঁপে—কৃপা করুণা মমতা!

যদি দেবদত্তর দৈনন্দিন জীবনের ছবি সে-সুরই বাজিয়ে থাকে সুনন্দার মনে তাহলে তাকে গান শেখানোর ছল কেন করবে সে!

তাকে আর কি শেখাবে!

অগণিত মানুষের মনে এই সুর ছড়িয়ে দিতেই তো চায় দেবদত্ত। অলীক আবরণ খসে পড়ুক, চুরমার হোক বুকজোড়া দম বন্ধ করা অহঙ্কার। কৃপা করুণা আর মমতার সুর বাজুক একের জন্য অন্যের অন্তরে।

মানুষ শক্তিমান হয়ে উঠুক!

তাহলে সার্থক হবে দেবদত্তর উদ্যম।

কিন্তু সুনন্দার কথা ভাবতে ভাবতে অশান্তির ঢেউ ফুলে ওঠে তার মনে। এসব কথা হয়তো এখন না বললেই হত তাকে।

মূর্খের মতো অকস্মাৎ সে যেন তাল কেটে দিয়েছে, রূঢ় সত্য প্রকাশ করে থামিয়ে দিয়েছে আপনি বেজে ওঠা সুর। সুনন্দাকে আঘাতও করেছে।

তাই আসা যাওয়া বন্ধ হয়েছে তার।

অস্থিরতার ঝড় শিকড় উপড়ে ফেলেছে—সব নষ্ট করেছে। সুরশিল্পী হয়ে কেন দেবদত্ত তাল কেটে দিল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত রাগিনীর।

তবু মনে হয় সুনন্দা আসবে। এই ছোট ঠাণ্ডা ঘরে তার হাতের স্পর্শ লেগেছে— তার নিশ্বাস পড়েছে—তার সমবেদনা জেগেছে।

সে না এলে দেবদত্তর চলবে কেন!

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় রাস্তায় বেরিয়ে সামনের একটা দোকানে গিয়ে দেবদত্ত টেলিফোন তুলে নিল। সুনন্দার একটা খবর নেয়া দরকার। সে যখন কোন অন্যায় করে নি তখন এমন আত্ম গোপন করে থাকবার মানে হয় না।

সহজ স্বাভাবিক স্বরে যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব প্রকাশ করে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, সুনন্দা কথা বলছেন?

হ্যাঁ, আমি কথা বলছি, চমকে ওঠা থিতিয়ে যাওয়া চাপা গলার স্বর।

কি আশ্চর্য, বেশ জোরে কথা বলল দেবদত্ত, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি বলে কি সব সম্পর্ক শেষ করে দিলেন? একটা খবরও কি নিতে নেই?

আমার শরীর খুব খারাপ—

কি হয়েছে?

সুনন্দা উত্তর দিল না। টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ঢেউএ ধাক্কা খাওয়া হাওয়ার মতো অনেকক্ষণ শুধু রিম ঝিম শব্দ ভেসে এল।

দেবদত্ত বলল, আপনাকে দেখতে যেতে পারি ?

একটু অসুবিধা আছে—

জরুরি কথা আছে আপনার সংগে। একদিন দেখা করা দরকার। কবে দেখা হবে ?

আমার শরীর খুব খারাপ, সুনন্দা যেন অনেক কষ্টে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলল, আমারও দু একটা কথা বলবার আছে আপনাকে।

একটু কষ্ট করে এখুনি চলে আসুন, না হলে আমাকে দেখা করতে যাবার অনুমতি দিন ?

আমার শরীর যে খুব খারাপ।

দেবদত্ত হাসল, সেই কারণেই তো তাড়াতাড়ি দেখা হওয়া দরকার। শুধু শুধু অবাস্তর ভাবনা ভেবে আপনি শরীর খারাপ করেছেন !

আপনি কেমন আছেন ? সুনন্দার স্বর এইবার সহজ শোনাল।

খু-উ-ব ভাল।

কথা শুনেই বুঝতে পারছি !

তাহলে আসছেন আজ ?

দেখি তো। চেষ্টা করব।

আমি আপনার অপেক্ষা করছি কিন্তু। ছেড়ে দিলাম—

টেলিফোন নামিয়ে দেবদত্ত রাস্তায় নামল।

আগের মতো আবার মাঝে মাঝে আসুক সুনন্দা। তার খবর নিক। তার সংসার দেখে যাক। অবুঝের মতো কথা বলে আর কখনও দেবদত্ত প্রাণের সুহৃদ বিকাশ রুদ্ধ করবে না।

সৃষ্টি সাধনা যশ, কর্ম স্বার্থ দায়িত্ব সব কিছু ছাড়িয়ে সকল কিছুর ঊর্ধে প্রভাতের শান্ত ভরাট সূর্যের মতো, অন্ধকারে উত্তাল সমুদ্রের আলোক স্তম্ভের মতো, পর্বত মালায় সারা রাত ঝরে পড়া ঝলমল হিম শুভ্র তুষারের মতো সত্য হয়ে থাক একটি নাম—একটি মানুষ !

রাস্তা পার হয়ে এল দেবদত্ত। চারপাশে অনেক মানুষের ভিড়। মুড়ি কুলপি আইসক্রীম বিক্রি করছে ফেরিওয়ালা। চৈত্রের শেষ বেলায় ঝরে পড়া রোদ অফুরাণ আনন্দ বিলিয়ে দিচ্ছে—যেন ইচ্ছে করলে দুই হাতে মুঠি ভরে তুলে নেয়া যায়।

দেবদত্ত ঘরে ফিরে এল। হাওয়ায় উড়ে যাওয়া চাদর নতুন করেপাতল টেবিলে। এদিকে ওদিকে ছড়ান ছোট খাট জিনিশ পত্র যতটা পারা যায় সাজিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। তারপর দরজা খুলে বাইরে চোখ রেখে বসে রইল কখন সুনন্দা আসে দেখবার জন্যে।

সুনন্দা এল অন্ধকার হবার ঠিক আগে। তখন খেলা শেষ করে ছোট ছেলে মেয়েরা বাড়ি ফিরে যায়। আর রাস্তার সব আলো-গুলির একসঙ্গে দপ করে জ্বলে ওঠার সময়।

সেই আলোয় দেবদত্ত দেখল সুনন্দা তার দিকে এগিয়ে আসছে। গুণে গুণে পা ফেলছে যেন। অনেক সময় লাগছে তার এতটুকু পথ আসতে।

আজ মোটর নেই সুনন্দার। এত কষ্ট করে না এলেই তো পারত। দেবদত্ত উঠে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল সুনন্দার কাছে।

খুব কষ্ট হল আপনার! আমি বুঝতে পারি নি এত শরীর খারাপ।

বলেছিলাম তো। কিন্তু আপনার সংগেও তাড়াতাড়ি দেখা হওয়ার দরকার ছিল।

আসুন, একটু বিশ্রাম করে নিন আগে। কথা পরে হবে, দেবদত্ত চেয়ার টেনে দিল।

সুনন্দা আস্তে বসে পড়ল সেই চেয়ারে। আজ কোন দীপ্তি নেই তার চোখে। বিবশ শিথিল শরীর। শ্লথ অংগ ভংগি। লাবণ্যর সামান্য স্পর্শও নেই। সাধারণ সাদা সাড়ি পরে সে বেরিয়ে

পড়েছে। প্রসাধনের তুলি বুলোয় নি মুখে। বে-কায়দায় চলতে গিয়ে এক পাটি জুতোর স্ট্র্যাপ কখন ছিঁড়ে গেছে খেয়াল নেই।

একটা পুতুল যেন মনিবের ধাক্কা খেয়ে নিস্তেজ গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, আমাদের বাড়িতে যেদিন আপনাকে খেতে বলেছিলাম, যেদিন অনেক কঠিন কথা বলে ফেলে ছিলাম। হয়তো ভদ্রভাবে সে কথাগুলি বলা যেত—আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

দেবদত্ত বলল, যদি এই কারণে ভাবনায় ভাবনায় শরীরের এমন অবস্থা করে থাকেন তাহলে আপনি অন্যায় করেছেন। শুধু নিজের ওপর নয়—আমার ওপরও। আমিই তো সেদিন স্বার্থপরের মতো আপনাকে কতগুলো রূঢ় অবান্তর—এমন কি অবাস্তব কথা শুনিয়ে এসেছিলাম।

স্তিমিত কণ্ঠস্বর কাঁপল সুনন্দার, অবাস্তব বলছেন কেন?

আপনার দিক থেকে যা কল্পনার অতীত—যা অসম্ভব, সে-প্রসংগের অবতারণা শুধু অবাস্তব নয়, অপমানকরও বলতে পারেন।

না, আপনি আমাকে কোন অপমান করেন নি—

করেছিলাম বৈকি, দেবদত্ত মুখের বাঁধন যেন টান মেরে কোন অদৃশ্য হাত আলগা করে দিল। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল পূর্ণ পরিচ্ছন্ন কথার ভিড়, করুণায় হোক, মমতায় হোক, এক প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল আপনার মনে, আমি অসতর্ক মুহূর্তে সে-প্রদীপ উল্টে দিয়েছি। জোর করে আমি আপনার কৃপার অসদ্ব্যবহার করতে চেয়েছি—অন্যায় ভাবে সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছি।

তবু আপনি কোন অন্যায় করেন নি। আপনি আমাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাই তো দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আপনার সত্যের ভার গ্রহণ করবার উপায় আমার নেই। আজ আমি সেই কথাটাই আপনাকে বলতে এসেছি।

দেবদত্ত হালকা হাসি হেসে বলল, বলবার প্রয়োজন ছিল না। সেদিন আপনাকে ওই কথাগুলি বলেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

দেবদত্তর কথা শুনে সুনন্দাও অল্প হাসল, সব কথা এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন কেমন করে?

একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যায়।

সুনন্দা প্রশ্ন করল, আমি বুঝতে পারি না কেন?

খুব আস্তে আস্তে কথা বলল দেবদত্ত, বুঝতে পারেন। কিন্তু স্বীকার করতে বেধে যায়। গণ্ডির বাইরে পা বাড়াতে গেলে দম্ভে আঘাত লাগে। তাই এক পা বাইরে আর এক পা ভেতরে রেখে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে এমন চেহারা করেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে দেবদত্তর দিকে তাকিয়ে সুনন্দা বলল, কিছুই বোঝা গেল না কিন্তু।

দেবদত্ত হেসে বলল, আমার সত্যের ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা যে আপনার হবে না সে কথা আমি জানতাম। যা সহজ, যা স্বতঃস্ফূর্ত আজ তা গ্রহণ করা যায় না। অনেক ভাবতে হয়, কৃত্রিম অনুশাসন মেনে আর পাঁচজনের কাছে মান বজায় রাখতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত করা চলে কিন্তু সত্য স্বীকার করবার সাহস হয় না।

কথার ধাক্কায় সুনন্দার রুগ্ন শীর্ণ দেহ দেবদত্ত যেন ঝাঁকিয়ে দিল। সোজা হয়ে বসল সে। উত্তর দিতেই হবে কিন্তু কথা আসছে না মুখে।

দেবদত্ত কথা বলল আবার, নির্বাচনে সকলেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে চায়। আমিও চেয়েছিলাম।

সুনন্দার মুখ রুক্ষ কঠিন হয়ে গেল, আপনার সংগে যখন আমি দেখা করতে আসতাম তখন আপনি কি করেন না করেন তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতাম না।

দেবদত্তর প্রসন্ন মুখে হাসি ফুটে উঠল, সেটা সম্পূর্ণ আপনার একান্ত

ব্যাপার ছিল। সে-সমবেদনার কথা পাঁচজনের সামনে প্রকাশ করতে গেলে হয় তো আপনার মাথা নিচু হয়ে যাবে।

নিজেকে সংযত করবার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সুনন্দার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আপনাকে নিয়ে গর্ব করবার কি আছে বলতে পারেন ?

জোরে হেসে উঠল দেবদত্ত, কিছুই নেই। কৃত্রিম জিনিশ নিয়েই মানুষ গর্ব করে। তেমন কিছু আমার জীবনে যদি থাকত তাহলে আমিও আপনার কাছে এত সহজে মন খুলতে পারতাম না।

যন্ত্রের মতো সুনন্দা বলল, না খুললেই সব চেয়ে ভাল হত।

বেশ, কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। ফিরিয়ে নেবার জন্যেই তো দেখা করতে চেয়েছিলাম আপনার সংগে।

ধন্যবাদ! সুনন্দা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার আমি যাই ?

আবার কবে দেখা হবে ?

আর দেখা হবে না।

কথা ফিরিয়ে নিলেও নয় ?

না। আমার দেখা করবার উপায় নেই, হয়তো আর একটু হলেই হীরেশের কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যেত কিন্তু শেষ অবধি বলতে পারল না সুনন্দা।

আমি জানি, সুনন্দার সংগে আস্তে আস্তে পা ফেলে রাস্তায় চলতে চলতে দেবদত্ত বলল, আবার একদিন দেখা হবে।

সুনন্দা মুখ তুলে তাকাল, আমার অন্য বন্ধন আছে।

তবু একদিন আপনার সংগে আমার আবার দেখা হবেই। বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তীক্ষ্ণ শুকনো স্বরে সব শক্তি মিশিয়ে সুনন্দা বলল, না, হবে না! আপনার সংগে আমার আর কখনও দেখা হবে না।

সুনন্দাকে ট্রামে তুলে সোজা বাড়ি ফিরে এল দেবদত্ত। আলো নিভিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। মাথাটা ধরে উঠেছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। সব জেনে বুঝে সারা দিন চোখ কান খোলা রেখে চলা ফেরা করবার চেষ্টা করে এমন অবোধের মতো কাজ করা কোন মতেই উচিত হয় নি তার।

সুনন্দার সংগে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন না করলে দেবদত্তর শান্তি নেই।

হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁসফাঁস করা গুমোট গরম অসহ্য হলকা তুলছে ঘরের ভেতর থেকে। তবু দেবদত্ত উঠে বাইরে বেরিয়ে এল না। এখুনি একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে নিজের সংগে। পুর্বপুরুষের কাছ থেকে পড়ে যাওয়া মনের বিলাস চরিতার্থ করতে গিয়ে ব্যথা জর্জর মন নিয়ে আর সে এমন করে গড়িয়ে পড়বে না অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর।

ঠিক জবাব দিয়ে গেছে সুনন্দা। দেবদত্তকে নিয়ে তার মতো মেয়ের গর্ব করবার কিছু নেই। বারবার আকারে ইঙ্গিতে সে কথাটা জোর করে বুঝিয়ে দিতে চাইলেও লুকান মোহ আর অহঙ্কারে ভর করে কেন সে মাথা কোটে তার দরজায়!

নিজেকে আবিষ্কার করার উৎকট লজ্জা যেন খণ্ড খণ্ড করে দেবদত্তর শরীর। ভয়ংকর জ্বালা ধরা বিষ মিশিয়ে দেয়। জ্বলে যায় সে। আগুনের ঝাঁঝে মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চায়।

প্রথম দিন সেই শীতের সন্ধ্যায় যেদিন দেবদত্ত সুনন্দার দিকে, অভাবনীয়ের আবির্ভাবে ধ্যান ভাঙা হতবুদ্ধি তপস্বীর মতো, অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল সেদিন তার সাজের ঘটা, লাবণ্যের ছটা আর রূপের জৌলুস তাকে যাদু করেছিল। আর কিছু মনে আসে নি তার, এক তরফা কল্পনায় প্রাসাদ শিখরের ছবি দেখেছিল সে।

সেদিন সুনন্দার রূপটাই মুগ্ধ করেছিল দেবদত্তকে। জৈবিক আকর্ষণের পরিবর্তে সে কামনা করেছিল মানবিক প্রতিদান। যেন সুনন্দার সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে কোন অহঙ্কার থাকবে না, যেন তার সুষমার পিছনে প্রচ্ছন্ন অবহেলার সুর বাজবে না।

সুনন্দার রূপলাবণ্য-রাশির ভরা স্তবকে প্রথম দিন দেবদত্ত সব ভোলানো ঘ্রাণ পেয়েছিল। যত বাধা আর সতর্কতা, যত অবহেলা আর অপমান, কাজ আর অহঙ্কার সে-ঘ্রাণের মাদকতায় চৈত্রের ফিকে শুকনো পাতার মতো ঝরে গিয়েছিল—উড়ে গিয়েছিল।

সুনন্দার কাছে দেবদত্তর আত্মসমর্পণ তাই বাইরের উজ্জ্বল আভরণ দেখে মুগ্ধ চপল চিত্ত কাঙালের মতো। তার মধ্যে পৌরুষ নেই, গভীরতা নেই, হৃদয়ের আবেদন নেই। একটা মোহ আছে, যার বশে অন্তর বিস্মৃত হয়ে শুধু বাহির নিয়ে গর্ব করবার বাসনা জাগে মানুষের।

তেমন গর্ব করবার সাধ হয়েছিল দেবদত্তর।

যেদিন সকালে সুনন্দা মোটরে তাদের বাড়িতে প্রথম আসে সেদিন তারাময়ীর কাছেও তার মূল্য বেড়ে গিয়েছিল বৈ কি! অমন মেয়েকে ছাত্রী হিসেবে পাওয়া যেন দেবদত্তর সৌভাগ্য!

গানে তার উৎসাহ থাক বা না থাক, তার রূপ আছে, অর্থ আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা তো আছেই। মনের হীন দৈন্য নিয়ে দেবদত্ত সুনন্দাকে পাবার কল্পনায় লুব্ধ হাত বাড়িয়েছিল।

তার সেই হাত ভেঙে দিয়ে গেছে সুনন্দা। সে তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, আমাকে দেবার তোমার কিছু নেই। আর তোমার যা আছে তা দেখে আমার করুণা জাগতে পারে কিন্তু অন্য কোন অনুভূতি জাগবে না।

দেবদত্ত খাটের ওপর উঠে বসল। অন্ধকার ভাল লাগছে তার।

অমার্জনীয় অপরাধ করে সে যেন পালিয়ে এসেছে মানুষের চোখের আড়ালে। উৎকর্ণ হয়ে আছে কঠোর শাস্তির ঘোষণা শোনবার জন্যে।

আলোর জগৎ থেকে চিরকালের জন্যে অবসর গ্রহণ করতে পারলে নিঃসীম অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলতে চলতে হয় তো সে সন্ধান পেত দুর্লভ মণি কণিকার। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস জাগত তার। কৃত্রিম আলোর জগতে জন্মান্ধের মতো অহঙ্কারের দৃঢ় দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে আঘাত খেতে হত না।

আরও তো কত মেয়ে কণ্ঠের অপূর্ব মাধুর্য নিয়ে ইতিপূর্বে বহুবার দেবদত্তর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সংগীত সাধনার নীরব আবেদন জানিয়েছিল। তাদের শক্তি ছিল, দুর্বার আগ্রহ ছিল কিন্তু সামর্থ ছিল না। রূপ ছিল না। আর মূল্যবান আসবাবে সাজান ঘরের দেয়ালে উচ্চবিত্তের কোন সালঙ্কার চিহ্ন ছিল না বলেই হয় তো তাদের অন্তরের আবেদন, দেবদত্তর মধ্যবিত্ত মনে উৎসাহের তুফান তুলতে পারে নি। প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার সরীসৃপের মতো দেবদত্তরও বিষাক্ত ধমনীতে লুকিয়ে আছে।

তাই সাধনার চেয়ে ভান তার কাম্য। ফলের চেয়ে ফুল তার প্রিয়। মনের সম্পদের চেয়ে দেহের ক্ষণিক শোভা তার কাছে মূল্যবান।

ধমনীতে বিষ নিয়ে, লোভী পঙ্কিল বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে কোন সাহসে সে ব্যাপক একতার সুর বাঁধতে চায়—উদিত নিখিলের ছবি ফোটাতে চায়! বিবেকের ভয়ংকর দংশনে বিছানায় অন্ধকারে ছটফট করতে লাগল দেবদত্ত। মুক্তির আকণ্ঠ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বালিশে মাথা ঘষতে লাগল।

কতক্ষণ সে অস্থির হয়ে বিকট যন্ত্রণা অনুভব করল বলা কঠিন। হঠাৎ এক সময় দমকা হাওয়ার ঝলকে মাথা তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখল পথ নির্জন হয়ে গেছে।

চাঁদের কোন রূপালী আভা পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে কিনা বাইরে আলোর ঝলমলানির জন্যে ঘর থেকে ঝাপসা চোখে ঠিক বোঝা যায় না।

তবু আচমকা আগুনে ঝলসে যাওয়া মন নিয়ে হয়তো প্রাকৃতিক প্রলেপের আশায় দেবদত্ত তাকিয়ে রইল রাস্তার ওপারে ওই বিরাট বাড়ির পিছনে সারি সারি নারকল পাতার দিকে—যাদের গা বেয়ে সেই হাওয়ার ঝলক ছুটে এসেছিল একটু আগে।

আধখোলা জানলা হাত বাড়িয়ে ভাল করে খুলে দিল দেবদত্ত। হাওয়ার ছটফটানি, নারকল পাতার অস্থিরতা, রাস্তার পাশে সজীব ঘাসের মূক উদ্বেগ অল্প অল্প করে জ্বালা জুড়িয়ে দিতে লাগল তার।

এ ঘর থেকে লেকের জল দেখা যায় না তবু এক আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল সে। যেন লেকের স্থির জলে এইমাত্র ডুব দিয়ে এল। ইচ্ছে হল সামনের ওই ফাঁকা জায়গায় কিছুক্ষণ তাজা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি যায়।

দরকার নেই। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে দেবদত্তর। সুনন্দার ওপর অভিমান মিলিয়ে যাচ্ছে। নিজেকেও ক্ষমা করতে পারছে। প্রশান্তির আলো একটু একটু করে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে সেই অন্ধকার ছোট ঘরে। তাই এখনও আলো জ্বালতে ইচ্ছে করছে না দেবদত্তর।

আর একটু সময় যাক। আর একটু অন্ধকার থাক। তুষার কঠিন প্রাচীর কেটে কেটে, দুস্তর স্তর ভেঙে ভেঙে প্রকৃতির সর্বোচ্চ শিখরে সে আরোহণ করুক—যেখানে সুনন্দার সব অহঙ্কার লুপ্ত—সেখানে দেবদত্ত নিজেকেও খুঁজে পাক শুধু মানবিক বোধের নিবিড় উপলব্ধিতে, অপরিমেয় আনন্দের প্রগাঢ় উল্লাসে, কৃত্রিম ভাবনা চিন্তার উর্ধে আদিম অনুভূতির অবাধ প্রকাশে।

সেই অনুভূতি গভীর হয়ে উঠেছিল দেবদত্তর প্রথম দিন। আর

কিছু নয়। শুধু সেই তীব্র আদিম অনুভূতির প্রেরণায় সে তাকিয়েছিল সুনন্দার ঘন কালো চোখের দুই শান্ত মণির দিকে।

নিজের হাতে সদ্য সমাপ্ত করা মর্মর মূর্তির দিকে মুগ্ধ ভাস্কর যেমন তাকিয়ে থাকে। ঝড়ের সমুদ্রে এগিয়ে আসা বন্দরের আলোর কাঁপনের দিকে নিপুণ নাবিক যেমন তাকিয়ে থাকে। প্রথম ওঠা সূর্য আপন আলোয় ঘুম ভাঙা পৃথিবীর দিকে যেমন তাকিয়ে থাকে।

তেমন করেই সুনন্দাকে দেবদত্ত প্রথম দেখেছিল। সে-দৃষ্টি যদি মানুষের জটিল সমাজের সোপান পেরিয়ে সুনন্দার হৃদয়ে না পৌঁছয় তাহলে দোষ দেয়া যায় না তাকে। আজকের পরিবেশে সে-দৃষ্টি কৃত্রিমতার গণ্ডিতে আঘাত খেয়ে ফিরে আসবেই। আজকের ভাবনা চিন্তা তা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে দেবে না সুনন্দার মতো মেয়েকে। যদি সে-দৃষ্টি তার হৃদয়ে পৌঁছয় তাহলেও নয়।

মনের সম্পদে দেবদত্ত বিত্তবান হলেও তার মূল্যের পরিমাণ নিয়ে গর্ব করবার সামান্য বাসনা জাগবে না সুনন্দার। কারণ তার মা-বাবা, আত্মীয়-আত্মীয়া আর তার পরিচিত পাঁচজন এই নির্বাচনে কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাবে না। সুনন্দার মনে যদি কোন মূর্চ্ছনা কেঁপে থাকে তবুও সকলকে অস্বীকার করে হৃদয়ের সত্য প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই তার।

অলীক কৃতিত্বের অহঙ্কার থেকে সহজে মুক্তি আসে না।

হয়তো মুক্তি আনতে পারত দেবদত্ত। সে তো জানে, প্রেম চেয়ে পাওয়া যায় না! প্রেম জাগাতে হয়। যদি সে তার গানের মধ্যে দিয়ে, কাজের মধ্যে দিয়ে, সাধনার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে একটি একটি করে পাপড়ি খোলবার অবসর দিত সুনন্দাকে, তাহলে একটু একটু করে আপনি সরে যেত জোর করে চাপান বাধার প্রস্তর।

কিন্তু ফুল ফোটাতে পারল না দেবদত্ত।

কুঁড়ি ঝরিয়ে দিল শুধু।

এত কথা ভেবে নিজের সংগে বোঝাপড়া করতে করতে মা-বাবার কথা মনে পড়ে যায়। কতদিন তারাময়ীর সংগে দেখা হয় নি তার —কতদিন সস্নেহ অভিযোগ শোনে নি সে। সতীর কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে মাকে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল দেবদত্তর।

না, দরকার নেই। তাহলে আবার অশান্তির সৃষ্টি করা হবে তাঁদের সংসারে। অকারণে উত্তেজিত করা হবে।

হয়তো কলকাতা ছেড়ে বাইরে গিয়ে উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে তাঁদের। দুজনেই কিছু শান্ত হয়েছেন।

ভবতোষ বাবুর মনের 'অবস্থা এখন কেমন সেকথা দেবদত্ত ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু তেমন বিচলিত হয়ে না থাকলেও তারাময়ী যে খুব শান্তিতে নেই সেকথা সে জানে।

তবু বাবার মতের বিরুদ্ধে মা একটিও কথা বলবেন না কোনদিন। যতই দুঃখ পান তিনি, স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সব মেনে নেবেন। ভবতোষ বাবু হয়তো অসতর্ক মুহূর্তেও তারাময়ীর মনের আসল কথা বুঝতে পারবেন না।

মার কথা ভেবে কষ্ট হয় দেবদত্তর। পৃথিবীর কোথাও যেন শান্তি নেই। নিজের শক্তিতে তার সন্দেহ জাগে, নিজের ওপর বিশ্বাস হারায়। সে ঠিক বুঝতে পারে না কবে এই সমাজের পরিবর্তন হবে। হবে কিনা।

স্বামীর সংসারে প্রবেশ করে সতীও যেন তেমন করে আনন্দ অনুভব করতে পারছে না। দেবদত্তকে দেখলে তার দুঃখটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। কিসের অভাবে একেবারে নিভে গেছে সে। তাকে যেন মুখ বুজে অপরাধের শাস্তি বহন করতে হচ্ছে প্রতিদিন।

বাপের কঠোরতার ভাগ পেয়েছে সতী, মায়ের কোমলতার

অংশও মিশে আছে তার মনে। তাই সে দুঃখ পায়। কোমল আর কঠোরের দ্বন্দ্ব, পুরোপুরি জীবনের কিছুই পেতে দেয় না তাকে।

যখনই সতীর বাড়িতে যায় দেবদত্ত তখনই সুযোগ পেলে তাকে বোঝাতে দ্বিধা করে না, এমন করে সব নষ্ট করিস না সতী, তপনের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াস না। জেনে শুনেই তো বিয়ে করেছিস।

অনেক কষ্ট করে যেন গলার স্বর বের করতে হয় সতীকে, ভেবে ছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে দাদা।

হবে, হবে। কিন্তু হাসিমুখে সব ঠিক করবার জন্যে প্রস্তুত হ। এমন অধীর হয়ে ভেঙে পড়লে নিজের ক্ষয় ছাড়া আর কিছুই হবে না।

না না, দেবদত্তর সামনে নিজের বেদনা অস্বীকার করবার ভংগিতে মাথা নাড়ে সতী, ভেঙে পড়ব কেন, আমি খুব ভাল আছি দাদা। আজ শরীরটা একটু খারাপ কিনা। কেমন গা ম্যাজ ম্যাজ করছে কাল থেকে।

সতীর কথা শুনে দেবদত্ত মনে মনে হাসে। আসল কথাটা স্বীকার করতে তার কাছে এখনও কেন এত লজ্জা সতীর!

হয়তো এমনি হয়। সোজা কথাটা বাঁকা করে তোলবার প্রবৃত্তি মানুষের অনাদি কালের।

জীবনে জটিলতার স্বাদ মিশিয়ে না দিলে ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা হবে কেমন করে।

খুব সকালে তপন আর সতী এল দেবদত্তর বাড়িতে।

একটু আগে ঘুম থেকে উঠে বাইরে তাকিয়ে খাটের ওপর চুপচাপ বসেছিল দেবদত্ত।

আকাশ থেকে আলোর জোয়ার নেমেছে। হাওয়ার তেমন মাতামাতি নেই। আর একটু পরেই রোদ হবে প্রখর। ঘরের সব

জানলা বন্ধ করে না দিলে কড়া ঝাঁঝ আগুনের হলকার মতো গায়ে এসে লাগবে।

সতী আর তপনকে দেখে খুশি হয়ে দেবদত্ত বলল, এই রকম চলে আসবি মাঝে মাঝে। কি এমন দূরে থাকিস তোরা? কিছুদিন এসে থেকে যা না এখানে দুজনে। তোর হাতের রান্না খেয়ে জিবের স্বাদ বদলাই আমি?

কিন্তু সতী অমন করছে কেন? অনেক কষ্টে ভারী কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। তপনের দৃষ্টিও কেমন উদাস মনে হল।

একটা অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়ই। তাই হয়তো এত সকালে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা দুজনে। কিন্তু কি এমন ঘটতে পারে হঠাৎ?

বিচলিত স্বরে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে সতী? তোরা অমন করছিস কেন?

নিজেকে আর দমন করে রাখতে পারল না সতী। দেবদত্তর কোলের ওপর মুখ গুঁজে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তার মতো ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে এমন করে আর কখনও ভেঙে পড়ে নি।

তপন? তপন—কিছু বুঝতে পারছে না দেবদত্ত।

মা মারা গেছেন—

কে? কার মা? আমাকে সব খুলে বল সতী?

মা—মা গো—বিকট যন্ত্রণায় দেয়াল ফাটান আর্তনাদ করে উঠল সতী,—মা আর নেই দাদা—

ভাল করে বল? সতীর মাথা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে দেবদত্ত।

আমাদের মা, ফোঁপাতে ফোঁপাতে উপুড় হয়ে ছটফট করতে করতে সতী বলল, আমাকে লাথি মার, আমাকে মেরে ফেল—মাকে আমি খুন করলাম—

কথা শুনে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল দেবদত্তর। আবার সে খাটের ওপর বসে পড়ল।

সতী স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তার কাছ থেকে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাবে না। তপনের কাছ থেকে সব শুনল সে।

দু একদিন হল এলাহাবাদ থেকে ভবতোষ বাবু কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাঁর আপিসের এক বন্ধু সতীকে দিয়েছেন এই শোক সংবাদ। তা না হলে শিগগির খবর পাবার সম্ভাবনা ছিল না তাদের।

খবর পেয়েই সতী আর তপন গিয়েছিল ভবতোষ বাবুর সংগে দেখা করতে। সেই বন্ধুর কাছেই তাঁর নতুন ঠিকানা পেয়েছিল তারা।

তাদের দেখে চমকে উঠলেন ভবতোষ বাবু। ভূত দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে কতকটা তেমনি করে।

একটি কথাও বললেন না। প্রণাম করবার আগেই সশব্দে দরজায় খিল তুলে দিলেন। ভেতরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেল না তারা। তাঁকে আর বিরক্ত করবার সাহস হল না।

সেখান থেকে ওরা সোজা চলে এসেছে এখানে।

তপনের সব কথা শোনবার মতো মনের অবস্থা দেবদত্তর নয়। যেটুকু সে শুনেছে সেটুকুই তাকে দিশাহারা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বৈশাখের প্রখর আলো ম্লান হয়ে গেছে। একটু একটু করে মাটি কাঁপছে। অস্বস্তিকর বেসুরো রাগিনীর ভয়ঙ্কর আওয়াজ কানে এসে লাগছে। সহ্য করতে পারছে না দেবদত্ত।

ভাবতে পারছে না তারাময়ী নেই!

আঘাত দিয়ে বেদনা জেগেছিল।

মিষ্টি কথায় নিজের অবস্থা দেবদত্তকে বুঝিয়ে বলবার জন্যেই সুনন্দা তার সংগে দেখা করতে গিয়েছিল শেষ দিন।

আর দেখা না হলেই ভাল হত। আর কথা না হলেই আস্তে আস্তে হয়তো বেদনা মুছে যেত।

কেন অকারণে আরও আঘাত দিয়ে নিজের হীন মনের স্মৃতি তার কাছে রেখে এল সুনন্দা!

কোন পরিচয় দিয়ে এল!

কিসের গর্ব করে এল!

দৈন্যের? রূপের? অশিষ্টতার?

ইচ্ছে করলে সবই তো সে দিতে পারত সুনন্দাকে। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারত। সুনন্দা তো তাই চায় মানুষের কাছ থেকে।

কিন্তু সে তা করে নি। অহঙ্কারের ডালা ভরে এসে দাঁড়ায় নি সুনন্দার সামনে। পৃথিবীর সব চেয়ে নিঃস্ব মানুষ হয়ে বোধহয় সে এক মাত্র তাকেই কামনা করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সুনন্দার, নিঃস্বের মহৎ রূপ সে দেখতে পেল না।

তাই সুনন্দার মনে হয় আঘাত করেছে ও নিজেকেই। ধারালো ছুরির নিপুণ খোঁচা দিয়েছে। জ্বলছে। টনটন করছে। যন্ত্রণা দিচ্ছে। সারা দিন। সারারাত।

কাউকে বলবে না। চিৎকার করবে না। জ্বলবে। জ্বালাবে। সহ্য করবে।

কে জানে কতদিন।

কঠিন দৃষ্টি পড়েছে অলকার। মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ করেন। সতর্ক করে কথায় কথায় ভয় দেখান ধর্মমানে নির্বাসন দেবার।

পালাতে তো চায় সুনন্দা। কিন্তু কার কাছে যাবে? কোথায় পালাবে? এ পৃথিবীর কোথায় গেলে জ্বালা জুড়োবে তার!

হীরেশ কত দূরে? কবে আসবে সে!

আর দেরি নেই তার আসবার। কলকাতায় আসবার। আরও কাছে আসবার। তার সুবিধা মতো, বাপ-মায়ের ইচ্ছে মতো এই বৈশাখের যে কোন দিন। হীরেশের কাছে আসবার দিন।

তাই আসুক। জ্বালা জুড়িয়ে দিক। আসুক সুনন্দার মুক্তির দিন।

তবু থেকে থেকে কি যেন কাঁপে। অন্ধকারে। অবসাদে। বেদনায়। কি যেন জ্বলে!

কিন্তু আর নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে মুছে ফেলতে হবে এই আকস্মিক আলোর কাঁপন। কালি ঢেলে মিলিয়ে দিতে হবে। আজ থেকে। এই মুহূর্ত থেকে। যেমন করে হোক।

দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সুনন্দা ভাবে, কেন এমন হল! কেন সেদিন অমিতাদের বাড়িতে সে গেল গান শুনতে! কেন গান শিখতে রাজি হল!

লম্বা ছুটি নিয়ে বর্ধমান থেকে প্রমোদনাথ এসে যাবেন কয়েক দিনের মধ্যে। সারা বাড়ি রঙ করা হচ্ছে। পুরানো দর্জি আসে প্রায়ই সকালে। আত্মীয়দের আসা যাওয়া শুরু হয়েছে।

বাইরে হাওয়ার গতি গেছে কমে। আলোয় মাদকতা নেই। ফুলের বর্ণ বৈচিত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে। বৈশাখের উগ্র দাহ একাগ্র সাধনায় কঠোর তপস্বীর মতো ফুলের পরিণতি আনছে ফলে।

সাড়ির রঙ পছন্দ করা নিয়ে ব্যস্ত হয় না সুনন্দা। গয়নার কারু কাজ খেয়াল করে না। প্রসাধনের সরঞ্জামে ধুলো পড়েছে—তাও পরিষ্কার করতে বলে না কাউকে।

বাইরের কোন কিছুতেই যেন আর মন নেই।

কখনও আস্তে, কখনও জোরে, স্নেহে কিংবা বিরক্তিতে অলকা বলেন, ফল খাও, দুধ খাও। কি চেহারা হয়েছে আয়নায় দেখতে পাও না?

ভালই তো আছে মা।

ছাই আছে। কোথায় এ সময় যত্ন চেষ্টা করে একটু ভাল চেহারা করবে তা না একেবারে রুগির মতো কাঠ হয়ে বসে আছ।

সুনন্দা উত্তর দেয় না।

কি হয়েছে? শরীর খারাপ? ডাক্তার দেখিয়ে নেবে একবার?

না না, সুনন্দা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমার কিছু হয় নি মা! গরমে কিছু ভাল লাগে না, একটু থামে। চোখ তুলে গভীর দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে বলে, বড় গরম!'

পাখাটা আরও জোর করে দাও না! অলকা নিজেই রেগুলেটারের হাতল শেষ প্রান্তে খর করে সরিয়ে গতি বাড়িয়ে দেন পাখার।

কিন্তু পরিবর্তনে কোন ফল পায় না সুনন্দা। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও প্রকৃতিকে এড়াতে পারে না।

গ্রীষ্মের তাপ আরও বেশি করে অনুভব করে।

লম্বা ছুটি নিয়ে বর্ধমান থেকে কলকাতায় এলেন প্রমোদনাথ। দীর্ঘ দেহ। শান্ত সরল চেহারা। মুখে হাসি হাসি ভাব। মেয়ের বিয়ে দিয়ে যথাসময় ফিরে যাবেন কর্মস্থলে।

এবার বাড়ির নিচ তলা ভাড়া দিয়ে অলকাও গিয়ে থাকবেন তাঁর সংগে। সুনন্দার বিয়ে হয়ে গেলে কলকাতায় আর কাজ কি তাঁর!

হীরেশও এসে পড়ল একদিন। শুভ দিন ঠিক হল। বৈশাখের মাঝামাঝি। পনের কি ষোল তারিখ। সুনন্দা শুনেছে। মনে রাখে নি।

দোতলায় ওঠবার আগে হীরেশ এক তলায় হয়ে গেল। অলকাকে নমস্কার করল। হাতে হাত মিলাল প্রমোদনাথের সংগে।

কিন্তু সুনন্দাকে চিনতে দেরি হল তার, এমন চেহারা হল কেন তোমার? অসুখ হয়েছিল?

সুনন্দা কথা বলবার আগে অলকা বললেন, হ্যাঁ, খুব ভুগে উঠল কদিন আগে। এই তো সবে ভাত খেয়েছে।

কই আমাকে জানাও নি তো?

অসুখের কথা কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে না আমার, আস্তে বলল সুনন্দা।

সুনন্দার চেহারা দেখে হীরেশের বিস্ময় ভাল লাগল না অলকার। অপ্রসন্ন চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন হীরেশ ওপরে গেলে কড়া করে তাকে রূপ চর্চা সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন।

মেয়েটার বুদ্ধি হল না এখনও। হীরেশ আজ আসবে জেনেও একটু সাজ করে নি। আগে কথাটা খেয়াল করেন নি অলকা, তাহলে নিজেই চেহারা ফিরিয়ে দিতেন সুনন্দার।

হীরেশ চলে যেতেই অলকা বললেন, কাণ্ড-জ্ঞান নেই তোমার? একটু ভদ্র বেশ-বাস করতে পার নি?

আর কি দরকার মা? বিয়ের দিন তো ঠিক হয়ে গেছে।

তা বলে ডাইনির মতো চেহারা করে বসে থাকবে? রূপ না থাকলে ছেলেরা ফিরেও তাকায় না। কেন শুধু শুধু হীরেশকে চেহারার খোঁটা দিতে দিলে?

হাসল সুনন্দা, এবার থেকে সাবধান হব।

আমাকে লক্ষ রাখতে হবে। যা বোকা হচ্ছ তুমি দিন দিন—গজ গজ করতে করতে অলকা বেরিয়ে গেলেন।

অনেক দিন পর প্রথম দর্শনেই সমালোচনা করল হীরেশ। কিছু ভেবে বলেনি সে। ভুল কথাও বলে নি। তবু বৈশাখের রোদ কেমন থমথমে মনে হল সুনন্দার। মোচড় খেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিকেল বেলা সুনন্দাকে সংগে নিয়ে বেড়াতে যাবে হীরেশ।

বাবার গাড়িটা নিজেই চালাবে! অনেক দিন কথা হয় নি তার সংগে সুনন্দার। কথা জমা হয়ে আছে অনেক।

কিন্তু বেরোবার আগে মার কাছে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে সুনন্দাকে। সহজে পুরো নম্বর তাকে দেবেন না তিনি। নিজের হাতে মেয়েকে সাজিয়ে হীরেশের সংগে বেড়াতে যেতে দেবেন।

আহা হা, ওটা কেন, আর রঙীন সাড়ি নেই তোমার? অন্য একটা টেনে বের করেন অলকা, নাও এটা পরবে। কানে আবার ওটা কি পরেছ? হীরের টাব দুটো কোথায়? কি আশ্চর্য, আজ কালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়ে ভাল করে সাজতেও শেখ নি? আগে তো এমন গেঁয়ো ছিলে না। কি ব্যাপার? এ সবে তোমার মন নেই দেখছি?

আজকাল কেউ অত সাজে না মা।

থাম, লেকচার দিতে হবে না আমাকে। আবার রূপের খোঁটা খাবে, সেটা কি ভাল? ওতে আমার দুর্নাম হয় সে কথা বোঝ না কেন?

সুনন্দা ঠিক বুঝতে পারে না মার দুর্নাম কেন হবে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না সে। মুখ ফিরিয়ে হাসতে ইচ্ছে করে তার।

অলকার এই দৈন্য হাস্যকর মনে হয় সুনন্দার। নকল রূপে হীরেশকে ভোলাতে চলেছে বলে নিজেকেও ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে না।

রূপের আড়ালে, সযত্ন প্রসাধনের পিছনে, সব কিছুর অভ্যন্তরে যেন একটা বিরাট ফাঁকি লুকিয়ে আছে।

অলকা তা আরও প্রকট করে তোলেন।

তবু বৈশাখের নিরাভরণ গাছের দিকে তাকিয়ে ফলসম্ভারের ইঙ্গিত পায় সুনন্দা। মনে হয় তারও অঙ্গ থেকে তপস্বী গ্রীষ্মের কঠোরতায় চঞ্চল বিভ্রান্ত বসন্তের উধাও ফুলের মতো একে একে খুলে পড়বে সব অলঙ্কার। খসে পড়বে বাইরের যত আবরণ।

অলকা আজ তাকে যতই সাজান!

পার্ক স্ট্রীট ধরে ওরা চৌরঙ্গীতে পড়ল। তারপর সোজা এগিয়ে গেল ফোর্ট উইলিয়মাস-এর দিকে। এক টানা পথ। কোন বাধা নেই। মোটরের গতি অনেক বাড়িয়ে দিল হীরেশ।

পথের দু ধারে প্রবীণ গাছের সারি। শুষ্ক গম্ভীর। কিন্তু অচঞ্চল স্থির। হাওয়া নেই। সৌরভ নেই। গাড়ি জোরে চলছে বলে চুল উড়ছে সুনন্দার। আঁচল উড়ছে বার বার।

দিগ্বিদিকে মাতনের উদভ্রান্ত গান আজ শুনতে পাচ্ছে না সুনন্দা। মূর্ত অস্বস্তি মনে হচ্ছে জীবন। ভেবেছিল অনেক কথা জমা হয়ে আছে হীরেশের জন্যে। কিন্তু এখন মুখে কথা নেই একটিও।

তুমি অনেক বদলে গেছ নন্দা।

সুনন্দা ম্লান হাসল, কেন?

বুড়ির মতো হয়ে গেছ।

না না!

আমাকে দেখলে তোমার চেহারা বদলে যেত, কিন্তু এবার—

ভয় পেয়ে সুনন্দা বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। অসুখে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি বলে এমন হচ্ছে।

ঠোঁটের ফাঁকে সিগ্রেট চেপে হীরেশ বলল, কিংবা হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে। দিল্লীতে একেবারে অন্য রকম মেয়েদের দেখেছি কিনা!

তারা কি রকম?

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হীরেশ, ভেরি স্মার্ট। জড়তা নেই। সঙ্কোচ নেই। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রঙ—

বাধা দিয়ে সুনন্দা বলল, ওদের দেখেছ বলে এবার আমাকে তোমার ভাল লাগছে না।

ঠিক তা নয়। তোমার চেহারা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে।

মোটর থামাল হীরেশ। ফোর্ট উইলিয়ামস-এর দিকে যে পথ চলে গেছে তার ধারে একটা ছোট সাঁকোর ওপর বসে পড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে সুনন্দা বসবার আগে সে ধুলো ঝেড়ে দিল।

এ পথে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে। সামনে খোলা মাঠ। অল্প হাওয়া উঠল।

সুনন্দার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে হীরেশ জিজ্ঞেস করল, কি করে কাটালে এত দিন?

গান শিখছিলাম।

গান? গানে তোমার উৎসাহ আছে নাকি?

আগে ছিল না, আকাশের দিকে তাকাল সুনন্দা, এখন হয়েছে।

শোনাও একটা গান।

আজ নয়।

আর কিছু শিখলে না কেন?

কি?

সুনন্দার কাঁধের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল হীরেশ। আর একটা সিগ্রেট ধরাল। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। শীর্ণ করুণ দেখাচ্ছে সুনন্দাকে।

আমি ভেবেছিলাম, সমালোচকের দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে তাকাল হীরেশ, আমার কথা ভেবে তুমি চাল চলন বদলে নেবে। কিন্তু কই, ইংরেজী ঝালিয়ে নেবার কোন চেষ্টা তুমি করেছ বলে তো মনে হয় না।

উষ্ণতা কাঁপল সুনন্দার উত্তরে, আর কিছু শিখতে ইচ্ছে করে না আমার।

তাহলে তোমার নিজেরই অসুবিধা হবে। তোমাকে এক ঘরে হয়ে থাকতে হবে।

তুমি তো থাকবে!

কিন্তু অন্য কারুর চেয়ে তোমাকে আমি ছোট ভাবব কেন?

তাই তো ভাবছ!

সুনন্দা জুড়িয়ে গেল। নিভে গেল। তাকে নিয়ে গর্ব করবার কিছু নেই হীরেশের। তবে কেন পাওয়ার অহঙ্কার রঙীন কাঁচ তুলে ধরে তার চোখের সামনে।

তুমি গান গাইতে পার? হীরেশের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে সুনন্দা প্রশ্ন করল, এমন কোন আশ্চর্য গান যা শেখা যায় না, শেখান যায় না—যে গান মানুষের মনে হঠাৎ আপনি বেজে ওঠে?

ভীত দৃষ্টি হীরেশের, তুমি তো জান গান বাজনায় আমার বিশেষ ঝোঁক নেই—

জানি। তুমি শুধু মানুষকে এক ঘরে করে রাখতেই পার। সমালোচনা করে আঘাত দিতে পার—ছোট প্রমাণ করতে চাও!

হীরেশ হাসল, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ সুনন্দা। তোমার ভালর জন্যেই আমি এসব বলি। তোমাকে সংশোধন করবার অধিকার কি আমার নেই?

না। আমার দোষ কেন চোখে পড়বে তোমার? তুমি কি আমার শিক্ষক?

ব্যাপারটা হালকা করে তোলবার জন্যে হীরেশ বলল, গুরু তো বটেই।

গুরু সমালোচনা করে সংশোধন করে না—সমবেদনার আলোয় ভুল ভ্রান্তি অক্ষমতা ঢেকে দেয়। কে বলল তোমাকে একজন আসাধারণ মানুষ ভেবে তোমার কথায় আমি সুবোধ বালিকা হয়ে উঠব?

আঘাত খেয়ে ফণা তুলল হীরেশ, সবাই তো হয়, তুমিই বা হবে না কেন?

জানি না। তুমিই বা গান গাইতে পারবে না কেন?

তুমি পাগলের মতো কথা বলছ সুনন্দা। নিশ্চয়ই তোমার মাথার দোষ হয়েছে।

দোষ কি গুণ বলতে পারব না। চল এবার ফেরা যাক। এভাবে এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে না আমার!

এলে কেন? হীরেশের চেহারা মুহূর্তে রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠল. তোমার মেজাজ দেখাবার জন্যে আমাকে এখানে টেনে আনবার কি দরকার ছিল?

দরকার ছিল বৈকি, চুপ করল সুনন্দা। ভাবল বলবে কিনা। জিবের রাশ টানতে পারল না। বলেই ফেলল, যে দরকারে তোমার মতো লোক আমাকে সমালোচনা করে ছোট করতে সাহস করে—

উত্তেজিত অমার্জিত স্বরে হীরেশ বলল, আমার মতো লোক কটা দেখেছ তুমি?

সেকথা আমার মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। যিনি লোককে নয়, লোকের চাকরিকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। তা না করলে তোমার মতো একটি লোকও দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হত না।

জোরে হেসে উঠল হীরেশ, দেখা যাবে কার দেখা পাও তুমি তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করে কোন গৌরব আমার বাড়বে না। তোমার মা-বাবার গৌরব হয় তো বাড়ত!

সুনন্দা রাগল না। আশ্চর্য আনন্দ বোধ করল সে। কাঁটা বাঁচিয়ে খুব সহজে যেন গোলাপ তুলে নিল। হীরেশের মুখোশ খুলে পড়েছে। তার এই কদর্য রূপটা দেখা দরকার ছিল সুনন্দার। নিজেকে দোষ দেবার, প্রবঞ্চনার অপরাধে অভিযুক্ত করবার কোনদিনও আর ইচ্ছে হবে না তার।

মা-বাবার হয় তো গৌরব বাড়ত, রাস্তা থেকে পাথরের টুকরো

তুলে খেলা করবার ভংগিতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে স্থনন্দা বলল, মেয়ে কিন্তু তা চায় না। তাই সে-পথে কাঁটা দিলাম।

এমন করে আমাকে অপমান করবার জন্তে এখানে টেনে না এনে সেকথা আগে জানিয়ে দিলেই তো পারতে।

স্থযোগ হয় নি, স্থনন্দার চোখ থেকে আনন্দ ঝরে পড়ছে, তুমি নিজেও তো মনের কথা এত স্পষ্ট করে আমাকে কখনও জানাও নি।

আমি কি জানাব?

আমাদের পরিবারকে ধন্য করবার কথা।

সেকথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

পারি বলেই তো তোমার মতো মানুষকে প্রত্যাখান করবার সাহস আমার আছে।

তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি ভাল করেই জান আমার কোন অভাব নেই।

খুব ভাল করে জানি, স্থনন্দা হাসল, আমারও সব অভাব মিটে গেছে। তাই তোমার চাকরির কোন মূল্যই আজ আমার কাছে নেই, উঠে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্থনন্দা বলল, যদি বুঝতাম আমাকে বাদ দিয়ে তোমার সামান্য অস্থবিধা হবে তাহলে কি করতাম জানি না।

গাড়ির মধ্যে বসে কেউ কোন কথা বলল না। কিন্তু নীরব থাকলেও স্থনন্দার মনে হচ্ছে কোথাও আর সামান্য অস্বস্তি নেই। মুক্ত পাখির মতো হালকা মনে হচ্ছে নিজের শরীর—পাখা মেলে গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

বাড়ি ফিরলে কি ঘটবে স্থনন্দা জানে। বাবা অবাক হয়ে যাবেন। মা চিৎকার করে গালাগাল করবেন। বন্ধুরা মূর্খ বলে বিদ্রূপ করবে।

করুক! সুনন্দা যেন সকলের নিন্দা-প্রশংসার উর্ধে উঠে গেছে। বাইরের কোন মোহ তার সত্য এক তিল টলাতে পারবে না। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের ভাগ সে শুধু একজনকেই দেবে।

সে জানুক নিজেকে বঞ্চিত করে আর পাঁচজনের কাছে শুধু নির্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মধুর মিথ্যা নিয়ে বাঁচতে চায় না সুনন্দা। লোকভয় তুচ্ছ করে কঠোর সত্য ঘোষণা করার সাহস তারও আছে।

এখনও ফোর্ট উইলিয়ামস স্পষ্ট দেখা যায়। খোলা মাঠ। দূরে দুর্গের নিশান উড়ছে। পলক হীন চোখে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল সুনন্দা।

একদিন অসংখ্য সৈনিকের আত্মরক্ষার জন্যে ওই দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই পৃথিবীর কোথাও এমন কোন দুর্গও তো আছে, যেখানে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে নিজের সত্য রক্ষা করা যায়—যেখানে শত্রুর প্রবেশ দুঃসাধ্য।

শুধু দুটো ঘর। একটা তানপুরা। বই। খাট। টেবিল। চেয়ার। নীল পর্দা। নীল চাদর।

আভরণ নেই। আবরণও নেই।

আনন্দ আছে। আলোড়ন আছে। আন্দোলন আছে।

সে-দুর্গ কতদূর?

দিন দু একের জন্যে অনিল কলকাতায় এল। খুব কষ্টে সময় করে সে আসতে পেরেছে। বড় ব্যস্ত সে এখন। আবার কবে আসতে পারবে জানে না।

অমিতা অনিলকে দেখে চমকে গেল। সাজ-পোশাক একেবারে

বদলে ফেলেছে সে। এখন ওকে চিনতে সত্যিই বেশ দেরি লাগে চেনা মানুষের।

কথা বেশি বলে এখন অনিল। টাকার গল্প। গাড়ি কেনবার স্বপ্ন। আরামে প্রাচুর্যের মাঝে দিন কাটাবার কাহিনী। নিজেই একটা গানের ছবি করবার ভাবনা।

অমিতা মুখ বুজে শুধু শোনে। কথা বলে না। তর্ক করে না। সে তো জানত সব। কথা বাড়িয়ে মেজাজ খারাপ করে লাভ কি।

ভেবেছিলাম একটা ছবি করেই চলে আসব কলকাতায়, কোটের স্লিভ বাঁ হাতে সাবধানে একটু সরিয়ে ঘড়ি দেখে অনিল বলল, কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না। আমার কথা রেখে প্রডিউসার যখন আমার মনের মতো কাজ করতে দিল তখন তারও কথা রেখে তার মনের মতো কাজ না করে চলে এলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। তা ছাড়া সুযোগ যখন পেলাম তখন আরও দু একটা কাজের ভার নিতে হল। অবশ্য গল্পগুলো হালকা জাতের। তাই নিজের নাম দেব না। একটা ছদ্ম নাম দিয়ে দেব।

নীরস স্বরে অমিতা বলল, নিজের নাম দিলেই বা ক্ষতি কি

বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর ভংগিতে হাসল অনিল, আজে বাজে কাজ করছি সেকথা লোককে জানিয়ে লাভ কি? আমার টাকা করা নিয়ে কথা।

তোমার তো বেশ বুদ্ধি খুলেছে অনিল!

টাকার গন্ধ নাকে লাগলে বুদ্ধি আপনি খোলে মানুষের।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, দু এক মিনিট• চুপ করে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অমিতা বলল, আমিই শুধু বোকা ছিলাম। তোমার যখন টাকা ছিল না তখন তোমায় ভালবেসেছিলাম।

আশ্চর্য! অনিল রাগল না অমিতার কথায়। প্রচ্ছন্ন স্নেহের

ইংগিতও ধরতে পারল না। অমিতা যে একদিন এমন ভাবনা ভাববে সেকথা আগে বুঝতে পেরে সতর্ক হয়েছে বলে উল্লসিত হয়ে উঠল।

সেকথা ভেবে কোনদিনও তোমাকে দুঃখ পেতে হবে না বলেই তো আ।ম টাকা রোজগারের দিকে মন দিয়েছি, বুক পকেট থেকে কুড়িটা একশ টাকার নোট বের করে গুণে গুণে অমিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অনিল বলল, এই যে তোমার সেই দু হাজার টাকা। কত অল্প সময়ের মধ্যে রোজগার করতে পারলাম দেখলে?

কিছু না। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। দুলছিল। কাঁপছিল। দিগন্তের আকাশ ঢালা রঙ। মনগড়া মর্মর প্রাসাদ। বিলীন হল। টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

মাত্র দু হাজার টাকার জন্যে জাত খোয়ালে? তুমি এত সস্তা অনিল?

জাত খোয়াব কেন? জাতে উঠলাম বল।

আমি যদি জানতাম তুমি এমন করে দেনা শোধ করবে তাহলে কখনও সেদিন তোমাকে টাকা দিতাম না। আজ তোমার নিজের কঠিন অসুখ হলেও তোমার জন্যে অর্থব্যয় করবার প্রবৃত্তি আমার হবে না।

অনিল হেসে বলল, আর আমার টাকার দরকার হবে না অমিতা।

দু হাজার টাকার না হোক দু লাখ টাকার দরকার তো হতে পারে। কে বলতে পারে কার কখন টাকার দরকার হয়?

দৃঢ় স্বরে অনিল বলল, তবু সে-ঋণও শোধ করবার ক্ষমতা আজ আমার হয়েছে।

তাই নাকি? শ্লেষ ফুটে উঠল অমিতার কথায়, কিন্তু যে চরিত্র

বিকিয়ে ঋণ শোধ করে, তাকে ঋণ দেবার কথা আমি ভাবতে পারি না অনিল! সেদিন তোমাকে আমি ওই সামান্য টাকা ধার হিসেবে দিই নি। লগ্নি কারবার আমার নেই। তোমার চরিত্র ছিল বলে ওই টাকায় তোমার সেবা করতে পেরে ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম।

অনিল বলল, কিন্তু তবু ধার শোধ না করলে সারা জীবন তোমার কাছে আমাকে ছোট হয়ে থাকতে হত—

ঠিক কথা। এত সহজে যে মানুষ দেনা পাওনা চুকিয়ে দেয় তার সংগে ব্যাপক ঋণের সম্পর্ক রাখতে নেই তোমার সংগে আমার এই মুহূর্ত থেকে সব শোধ বোধ হয়ে গেল। আমিও সারা জীবন তোমার কাছে থেকে তোমাকে ছোট বলে ভাবতে পারব না।

এখনও কিছু বুঝল না অনিল, ছোট বলে ভাবতে হবে না অমিতা। আমি গুছিয়ে নিয়েছি। তোমাকে কখনও অর্থ কষ্ট পেতে হবে না—

নিজেকে আর সংযত করতে পারল না অমিতা, কত টাকা করেছ তুমি? কাকে টাকা দেখাতে এসেছ অনিল? সাত পুরুষের জমিদার বাড়ির মেয়েকে তুমি টাকা দেখিয়ে ভোলাতে এসেছ?

ছি ছি, এ তুমি কি বলছ অমিতা? উঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে অনিল বলল, ভোলাতে আসব কেন? তোমাকে সুখে রাখব বলে আমি আশ্বাস দিতে এসেছি—

বিকৃত মুখে চড়া স্বরে টেনে টেনে অমিতা বলল, আশ—সা—শ! ব্যক্তিত্বহীন ক্লীবের ঐশ্বর্য দেখে আমার মতো মেয়ে কখনও কোন আশ্বাস পায় না। আমাকে মুগ্ধ করবার মতো ঐশ্বর্য কিংবা চরিত্র—আজ কোনটাই তোমার আর নেই।

অনিল বিব্রত হয়ে কি বলবার চেষ্টা করল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আরও জোরে বলল অমিতা, তেমন কেরানি-মনের অনেক মেয়ে তুমি বাংলা দেশে পাবে—যারা শুধু টাকা দেখে তোমার মতো

ক্লীবের গলায় মালা দিয়ে ধন্য হয়ে যায়। তাদের একজনকে খুঁজে নাও। আমাকে অপমান করতে আর কোনদিনও তুমি এখানে এস না।

তুমি উত্তেজিত হয়ে কথা বলছ অমিতা—

তোমার সংগে আর কোন কথা বলতে চাই না আমি। তোমার নিশ্বাস গায়ে লাগার গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চাই—

অনিলকে আর কথা বলবার অবসর না দিয়ে অমিতা উঠে নিজের ঘরে চলে এল।

কিছু নেই কোথাও। একটা গুহায় শুধু মূক অন্ধকার। এপাশে বোধহয় কোন সুদর্শন হরিণের শিঙ আর হাড়। হিংস্র জানোয়ার আর সব খেয়ে চলে গেছে। দুরন্ত লালসার উৎকট গন্ধ আছে এখনও গুহায়।

থাকবেও।

দেবদত্তর বাড়িতে বসে অমিতা বলল, বাবা ভেবেছিলেন দিদির মতো আমিও পাগল হয়ে রাঁচি যাব দেবুদা। বিয়ে হলেই নাকি আমাদের বাড়ির মেয়েদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাই রেগে অনিলের বাঁধান ফটো মাটিতে আছড়ে উনি ভেঙে ফেলেছেন।

অমিতাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে দেবদত্ত বলল, তোমার প্রেম ব্যর্থ হবে না। এর প্রতিদান অনিলকে একদিন দিতেই হবে।

অমিতা ম্লান হাসল, তুমি মিছেই আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। ব্যবসার সংগে পাল্লা দিলে প্রেমের জয় কোনদিনই হয় না।

তবুও প্রেম কালজয়ী।

ও কথা আর মানতে ইচ্ছে হয় না। অর্থের পায়ে প্রেম কথায় কথায় লুটিয়ে পড়ে। দেখতে পাও না তাই প্রেমও আজকাল ব্যবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

না। প্রেম প্রেমিক ছাড়া আর কারুর কাছে মাথা নামায় না। মনে ক্ষোভ জমেছে বলে তুমি অবিচার করছ—

ব্যস্ত হয়ে অমিতা বলল, না না দেবুদা, অনিলের ওপর আমার একটুও রাগ নেই। আমি জানি দোষ তার নয়।

দেবদত্ত হেসে বলল, দোষ যে-সমাজে অনিল বেড়ে উঠেছে সেই সমাজের। রাজার ছেলে যত সহজে ভিক্ষা নিতে পারে আমি ততো সহজে পারি না, অনিলও পারে না। প্রেমের দানও দম্ভের কাঙালপনায় আমাদের কাছে মাধুর্য হারায়।

সব বুঝি দেবুদা। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মনে ক্ষোভ নিয়ে আমি চোখ বুজে বসে থাকব না। পথ বড় পিছিল। বড় দুর্গম। আমি সতর্ক থাকব। গান গেয়ে জীবনকে চিনব—চেনাব।

তাহলেই দিনে দিনে প্রেমের আসল অর্থ তোমার কাছে সূর্যমুখীর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তোমার মতো মেয়ের একটি উদাহরণ লক্ষ অনিলকে ফেরাবে—চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে।

অমিতার চোখে জ্যোতি ফুটে ওঠে। আর কথা বলে না। চুপ করে বসে কি ভাবে অনেকক্ষণ।

একটু পরে দেবদত্ত আবার বলল, চল অমিতা কিছুদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে আসি ?

উৎসাহী হয়ে অমিতা বলল, কোথায় যাবে ?

অনেক দিন থেকেই তো ভাবছি বীরভূম কিংবা পূর্ববঙ্গ থেকে লোকসংগীত সংগ্রহ করে আনব, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে দেবদত্ত, ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের ওপর আমার শ্রদ্ধার কথা তোমরা তো জানই। এবার সাহস করে দুএকটা নতুন পরীক্ষা করব ঠিক করেছি।

কি করবে দেবুদা ?

প্রাচীন কালের বাউল যেমন আছে তেমন থাক। বর্তমান কালের বাউল একটু অন্য রকম হোক। ঘর ছাড়া হয়ে সে সুখ দুঃখের ভার ভগবানের ওপর চাপিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে না। সুর থাক বাউলের। কিন্তু ভাব আর ভাষা বদলে যাক। নিজের শক্তির মধ্যে ভগবানকে পাক সে। সন্ধান করুক আরও গৃহহীনের। তারপর শক্তিমান হয়ে আজকের বাউল জন্ম জন্মান্তর দেখুক একই জীবনে।

অমিতা বলল, ভজন নিয়ে তোমার পরীক্ষা সার্থক হয়েছে দেবুদা। বাউলেও হবে। কীর্তনে তো হবেই।

দেবদত্ত বলল, ভাব অন্য হলেও চেনা সুর মনে ধরতে দেরি হয় না মানুষের। তাই আমার মনে হয় যুগের উপযোগী লোকসংগীতের প্রচলন আরও তাড়াতাড়ি হবে, সে হাসল, অতি আধুনিক বাংলা গানে তার প্রমাণ আমরা অনেক বার পেয়েছি। যদিও আমি জানি না সে সব গান যাদের মনে করে লেখা হয়েছে তারা গায় কিনা।

কোন গানের কথা বলছ ?

এই ধর, ভাটিয়ালি কিংবা ওই ধরনের আরও অনেক গান। যেখানে শহুরে কবি জোর করে গ্রাম্য শব্দ চয়ন করে নিজের দৃষ্টি ভংগিতে কুচবরণ কন্যা কিংবা পাতার কুটিরের ফাঁকে ধোঁয়ার মেঘ বরণ কেশ দেখিয়ে অদ্ভুত অবাস্তব প্রেমে গায়ককে বিভোর করেছে।

অমিতা হেসে বলল, জানি। তবে সুখের বিষয় ওই ধরনের গানের আয়ু খুব অল্প দিনের। সব ফাঁকি আজ ধরা পড়ে গেছে বলেই তো আমরা এগিয়ে যেতে পারছি।

গানের মোড় ফেরাবার আরও অনেক কথা একের পর এক দেবদত্ত শোনায় অমিতাকে। বলতে বলতে অদম্য প্রেরণায় সে উঠে দাঁড়ায়। ঘোরাফেরা করে।

যে শ্রেণী জেগে উঠছে তাদের জন্যে গান বাঁধতেই হবে আজ। সম্মান আদায় করে নেবার গান গাইতে হবে।

তাদের এতদিন অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি জাতির কোন ব্যাপক সংগ্রামে। তাই স্বদেশী যুগের গানও তাদের জন্যে নয়। দৃষ্টির পরিবর্তন তো হয়ই যুগে যুগে। তাদের বাস্তব প্রেম, তাদের বিরহ, তাদের বেদনা-চেতনা গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবেই আজকের কবিকে—বর্তমান কালের গায়ককে।

দেবদত্ত হেসে বলে, অন্য শ্রেণীর জয়গান তো অনেক গাওয়া হল। অপূর্ব প্রেমের ছবিও ফোটান হল। এবার ওদের ভাঙনটাও দেখাতে হবে। প্রেমে ফাটল ধরার গানও গাইতে হবে।

অমিতা জিজ্ঞেস করল, কবে কলকাতার বাইরে যাবে?

গরমটা আর একটু কমে যাক। এখন গেলে ঘুরে বেড়ানো কষ্টকর হবে না?

তা বটে।

দেবদত্তর কথা শুনতে শুনতে অনিলের কথা নতুন করে মনে পড়ে যায় অমিতার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ও জোর করে চেপে যায়।

ক্ষুদ্র প্রাপ্তির জন্যে মহৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনা পায়ে মাড়িয়ে ভীরু কাপুরুষের মতো সে পালিয়ে গেছে ক্ষণিক আলোর জগতে। সেখানেই শেষ নিশ্বাস পড়বে তার।

অনিল যখন থাকবে না তখন আজ যাদের লাভের জন্যে সে কাজ করছে সেই অল্প সংখ্যক লোক হয় তো এক মুহূর্ত শোক করবে তার জন্যে। তারপর ভুলে যাবে। তার নাম করবে না আর কেউ।

শুধু অনিলের বেলায় কেন, কত বড় বড় গায়কের ক্ষেত্রেই তো তেমন ঘটেছে। যারা শ্রেষ্ঠ গায়কের সম্মান পেয়েছে, তাদের লোকে হাতে হাতে নগদ মূল্য দিয়েছে বটে কিন্তু চিন্তাশীল যুগশিল্পী বলে

সম্মান করতে পারে নি। কারণ বর্তমান সমাজ জীবনের সংগে কোন যোগ নেই তাদের গানের।

তাই গান শুনিয়ে ক্ষণকালের জন্যে মাতিয়ে দিলেও শ্রোতাদের কাছে তারা থাকে অন্য জগতের মানুষ হয়েই। মনে রেখাপাত করে কিন্তু আপনার জন বলে ভাবতে শেখায় না।

দূরের মানুষকে কত আর কাছে টানা যায়!
কত দিন আর মনে রাখা যায়!

থেকে থেকে বিমর্ষ হয়ে যায় দেবদত্ত। তারাময়ী নেই। সব ভুলে বাবার সামনে দাঁড়াবার প্রবল আগ্রহে সে অস্থির হয়ে ওঠে। বলুন তিনি কটু কথা। দেবদত্ত মুখ বুজে সহ্য করবে। মুখের ওপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে জোর করে সে আবার খোলাবে। ভবতোষ বাবুকে তার বাড়িতে নিয়ে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

কিন্তু ইচ্ছে পূর্ণ হল না দেবদত্তর। সতী একদিন জানাল তিনি আবার কলকাতার বাইরে চলে গেছেন। আর কোনদিনও কলকাতায় ফিরবেন না বলে গেছেন বন্ধুকে।

উপায় নেই। দম্ভের আগুনে পুড়ে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াবেন ভবতোষ বাবু যতদিন বাঁচবেন ততদিন। তবু সহজ সত্য মেনে নিয়ে শান্তি পাবেন না। হঠাৎ একদিন দেবদত্তর কানে পৌছবে তাঁরও মৃত্যু সংবাদ।

এমনি করেই জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে মধ্যবিত্ত পরিবার।

এ বাড়িটা ছেড়ে কাছাকাছি আর একটা বড় বাড়িতে শিগগিরই দেবদত্ত উঠে যাবে। নতুন গানের ইস্কুল খুলবে সেখানে। তার অনেক দিনের সাধ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সপ্তাহে দুদিন—শনি আর রবিবার গানের ক্লাশ বসবে। দেবদত্তর সময় বড় কম। সে আর যাবে না ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি। তারাই আসবে ওর বাড়ি ও দুদিন ক্লাশ করতে। আর যারা একেবারে নতুন তাদের ভার প্রথমে নিতে হবে নীলা আর অমিতাকে।

নিখিলের সংগে নীলা এসেছিল কাল। অনুযোগ করে গেছে। গান না গেয়ে তার নাকি গলা খারাপ হয়ে যেতে বসেছে।

দেবদত্ত রসিকতা করে উত্তর দিয়েছিল, বিয়ের পর গানে নীলার উৎসাহ কমে যাবে মনে করে সে আর তাকে ডাকাডাকি করে নি।

নীলা অভিমান করে বলেছিল, দেবদত্ত তাকে এমন ভাবলে সে দুঃখ পায়। তাদের সকলের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে একা একা আর সুখ ভোগ করবার সাধ নেই নীলার। পাঁচজনের মধ্যে থেকেই সে সুখী হতে চায়। কাজেই ভবিষ্যতে সে যেন তাকে এড়িয়ে না যায়।

কথা শুনে আনন্দ জাগে দেবদত্তর মনে। সে নিজেই তো অনেক দিন কাটিয়েছে আলস্যে, অবাস্তব কল্পনায়। আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। সকলকে নিয়ে সারা দিন রাতের কাজে মেতে উঠতে হবে।

দেবদত্ত কথা দিল আষাঢ়ের প্রথমে অমিতার সংগে সে যখন বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকসংগীত সংগ্রহ করবার জন্যে ঘুরে বেড়াবে তখন নীলা আর নিখিলকেও নিয়ে যাবে।

বেলা পড়ে এসেছে।

শান্ত হয়েছে বৈশাখের কড়া রোদ। প্রখর অশ্বখুরে ধুলো উড়িয়ে গেল উন্মত্ত হাওয়া।

আয়োজন সার। মেঘের নিটোল স্বাস্থ্য ছিন্ন ভিন্ন হল। বর্ষণ হল না। সংযম-অসংযমের বিচিত্র ঐক্যের সুর শুনিয়ে দিল প্রকৃতি।

অন্যমনা হয়ে যায় দেবদত্ত। পায়ের শব্দ যেন। পর্দা খস খস করে ওঠে।

প্রবেশের অনুমতি নেয় না সুনন্দা। ছায়ার মতো দেবদত্তর পাশে এসে দাঁড়ায়।

আবার এলাম, দ্বিধাহীন বাধাহীন স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

দৃষ্টি ফেরাতে পারে না দেবদত্ত। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। প্রথম দিনের মতো।

আমি জানতাম তুমি আসবে, সুনন্দার মুখোমুখি দাঁড়ায় সে, আবার এলাম নয়, বল এবার আমি এসেছি!

হয়তো বলতো। হয়তো বলতো না। ঠোঁট কাঁপছিল সুনন্দার। আধ ফোটা গোলাপ কলির মতো।

দেবদত্ত কথা বলতে দিল না তাকে। উষ্ণ স্পর্শে। জয়ের উল্লাসে। আদিম আনন্দে।

কিন্তু গোটা পৃথিবী জুড়ে তখনও অহঙ্কার ভর করে আছে। এক অহঙ্কার থেকে মুক্তির আর এক আশ্চর্য অহঙ্কার।

আর কিছু নেই।
